ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস

শান্তিময়ী সিংহ, এম. এ. বি. টি.

ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস

শান্তিময়ী সিংহ এম, এ, বি, টি,

প্রকাশক :
শ্রীদেবাশিস্ সিংহ
১০, প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা-২৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
(পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীসুরেশ দত্ত
সুমুদ্রণ
১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান :
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (পিঃ) লিঃ, ৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১
শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
বেঙ্গল বুক হাউস, ১৫৪, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬
ব্যানার্জীস্ বুক সিণ্ডিকেট, ৬৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলি-২৬

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য স্বর্গত গুরুদেব এবং বেলুড়মঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ

পরমপূজনীয়

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের

শ্রীচরণোদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাবনতচিত্তে

এই বইখানি সমর্পিত হল।

নিবেদন

ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হল। ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগ থেকে যুদ্ধোত্তরকাল পর্যন্ত ভারতের শিক্ষাধারার ক্রমিক ইতিবৃত্ত মাতৃভাষায় প্রকাশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা প্রথম সংস্করণে করেছি এবং ছাত্র-ছাত্রীগণও আমার এই প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন, সেজন্যে তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি বিশেষ সতর্কতার সহিত অনেকাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করবার সময়ে স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টের সারাংশও সংযোজিত করেছি।

এই গ্রন্থরচনায় যাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ মহা-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব এবং পরলোকগত শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেন, বি, এস, সি, এম, এড (লীড্স), টি, ডি (লণ্ডন), ডিপ, এড (অক্সফোর্ড), এফ, আর, জি, এস, এফ, এন, আই মহাশয়কে। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর স্বভাবসুলভ স্নেহবশতঃ তিনি বইটির প্রথম সংস্করণ অতিযত্নসহকারে আদ্যোপান্ত পাঠান্তে প্রয়োজনীয় নির্দেশদান করে আমায় চিরকৃতজ্ঞ করে রেখেছেন।

আর যাঁরা এই পুস্তকরচনায় আমায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীশর্বরীভূষণ পুরকায়েত, এম, এ, বি, টি, এম, এ (এডুকেশন) মহাশয় অন্যতম। তাঁকে এবং অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ

যাঁদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত আমার প্রচেষ্টাকে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হ'ত না তাঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বইটি ছাপানোর জন্যে সুমুদ্রণ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীসুকুমার দত্ত মহাশয়কেও আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও বইটিতে কিছু কিছু অপ্রীতিকর মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত।

কলিকাতা

৩১শে বৈশাখ ১৩৭১

গ্রন্থকর্ত্রী

ভূমিকা

অতীতে ভারতে শিক্ষার স্রোত নানা দিকে প্রবাহিত হ'ত। কিন্তু সেই স্রোতে জোয়ার ছিল না; শতাব্দীর পর শতাব্দী অনবরত ভাঁটা পড়ে শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত চিন্তা শুকিয়ে গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে মাঝে মাঝে সেই শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করার আবশ্যকতা যাঁরা বুঝতেন বা বুঝতে পারতেন তাঁরা কি ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থাদি করতেন বা করতে বলতেন সে তথ্য জানতে না পারলে বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল ভাবে করা চলে না। কাজেই এই সব তথ্য জানা দরকার। শ্রীমতি শান্তিময়ী সিংহ শিক্ষণ শিক্ষা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে (১৯৫৪-৫৫) এই সব সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন ও সেই আলোচনার ফলে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা এই পুস্তিকাখানিতে লিখেছেন। তাঁর লেখার ভাষা সুন্দর, ও তিনি তথ্যগুলির আলোচনা ধারাবাহিক ভাবে করেছেন। যদিও সব বৃত্তান্তগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তবুও তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে অনেক তথ্য জানতে পারা যাবে। সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষিকারা ও শিক্ষণ শিক্ষা বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা এই পুস্তিকা পড়ে আনন্দ লাভ করবেন ও কিছু শিখতে পারবেন এই বিশ্বাস করি। শ্রীমতী শান্তিময়ী সিংহের প্রচেষ্টা সার্থক হউক এই কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১০ই মার্চ্চ ১৯৫৬।

জিতেন্দ্র মোহন সেন
ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ,
শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

প্রথম ভাগ

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকে যুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত।

বিষয়-সূচী

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস

—(*)—

সূচনা

ভারতের যে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষাধারা ছিল তা আজ সর্বজনস্বীকৃত হলেও ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে অনেক বিদেশীই সেকথা স্বীকার করতেন না। তাঁরা যখন এদেশে আসেন তখন ভারতের পড়তির সময়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য প্রাচীন ব্যবস্থাগুলির মত শিক্ষাব্যবস্থাও নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। বহু প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে সময় এইগুলির সংস্কার সাধন করার উপায় এবং অবসর কোনটাই দেশবাসীর ছিল না। এর পর দেশের শাসনভার যখন ইংরেজের হাতে এল তখন তারা তাদের অধিকারকে ভালভাবে কায়েম করবার জন্যে নিজেদের ভাব-ধারা এদেশে প্রবর্তন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলে, বৈদিকযুগ থেকে দেশে যে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাধারা চলে আসছিল তার বদলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হল।

এই নব্যশিক্ষার প্রবর্তন করেন মিশনারীরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁরা এদেশে এসে-ছিলেন ধর্ম প্রচার করতে। প্রথমে তাঁরা নিজেরাই এদেশের ভাষা শিখতে লাগলেন বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করবার জন্য। পরে অনূদিত ধর্ম গ্রন্থের সাহায্যেই এদেশের লোকদের

কাছে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করলে যে সব সুযোগ সুবিধা লাভ হবে তার প্রলোভনও দেখাতে লাগলেন। এদিকে সামাজিক গোঁড়ামীর জন্যে তখন দেশের নিম্ন-বর্ণের লোকেরা নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিল। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার ওপর তাদের কোনই আস্থা ছিল না। ফলে, মিশ-নারীদের প্ররোচনায় অনেকেই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। মিশনারীরা এদের সবরকম দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এরা প্রায় সকলেই ছিল নিরক্ষর। অথচ খ্রীষ্টধর্মে বাইবেল পাঠ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তাই মিশনারীরা এদের শিক্ষা দেবার জন্যে স্বদেশীয় আদর্শে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আরও একটি কারণ ছিল, তা'হলো ধর্মান্তরিতদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। এইভাবে তাঁরা কখন আগে বিদ্যালয় স্থাপন করে তার ভেতর দিয়ে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন আবার কখনও আগে ধর্মপ্রচার করে পরে ধর্মান্তরিতদের সুবিধের জন্যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সব মিশন স্কুলের মাধ্যমে দেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হল। স্বল্প বেতনে কর্মচারী নিয়োগ করা সহজ হবে ভেবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও মিশনারী প্রব-র্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষণ করতে লাগলেন। তাছাড়া এদেশের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং মধ্যবিত্ত জনসাধারণও এই শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করেছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরা মনে করলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারাই দেশের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। আর মধ্যবিত্ত জনসাধারণ আর্থিক সুবিধেলাভের আশায় নব্য শিক্ষার প্রসার সমর্থন করতে লাগলেন। শিক্ষা প্রসারের নামে দেশে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ চলতে লাগল।

কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হল। রুশোজাপান যুদ্ধের

শেষে জাপান প্রভৃতি কয়েকটি জাতির অভ্যুদয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে লাগল। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার গলদ এদেশের লোকের কাছে আরও বেশী করে ধরা পড়ল। লোকে বুঝল যে পাশ্চাত্য শিক্ষার হুবহু অনুকরণ করে দেশের উন্নতি করা সম্ভব নয়। দেশের প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস, শাস্ত্র প্রভৃতি আবার লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তে লাগল। দেশবাসী চাইল প্রাচীন ও নবীন শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করতে। এরই ফলে সেসময় বিশ্বভারতী, জামিয়া-মিলিয়া, আলিগড় এবং কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

এদেশে শিক্ষাপ্রসার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন প্রধানতঃ তিনটি দল —(১) মিশনারী, (২) শিক্ষাবিভাগের ইউরোপীয় কর্মচারী আর (৩) ভারতীয় জনসাধারণ। একই কাজে ব্রতী হলেও তিনটি দলের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের স্থবিধে হবে বলে শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, শিক্ষাবিভাগের উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পবেতনে কর্মচারী নিয়োগ সমস্যার সমাধান করা আর ভারতবাসী চেয়েছিল শিক্ষার প্রসারের দ্বারা দেশের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ায় তিনটি দলের মধ্যে মতান্তর ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। প্রথমে অবশ্য বিরোধ বেধেছিল মিশনারী এবং শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে। কারণ তখন শিক্ষা-জগতে এই দুই দলই আধিপত্য বিস্তার করছিল। সে সময় ভারতীয়দের প্রচেষ্টা ছিল সামান্য।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হলেও প্রথম দিকে দেশের শিক্ষাসম্বন্ধে কোম্পানি নিরপেক্ষ ছিল। মিশনারীদের কাজে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই তখন কোম্পানি করে নি। ১৬৯৮ সালের সনন্দের পর ইউরোপীয় কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে নিজেদের এলাকায় কোম্পানি কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন

করে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের শিক্ষা সম্বন্ধে কোম্পানি আগের মতই নিরপেক্ষ হয়ে রইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তাদের এ মনোভাবের পরিবর্তন হতে লাগল। তখন অন্যান্য প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের পরাভূত করে কোম্পানি নিজের অধিকার অনেকটা কায়েম করে নিয়েছে। তার ওপর আবার ১৭৬৫ সালে বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি নেবার ফলে দেশের শাসনভারও তাদের করায়ত্ত হয়েছে। ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনভার হাতে আসায় কোম্পানির দায়িত্বও বাড়ল। একদল মুখ্য-স্থানীয় কর্মচারী রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে কোম্পানিকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষণ করবার জন্যে উৎসাহ দিতে লাগলেন। কিন্তু কোম্পানির কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল। তাঁরা স্বদেশীয় পার্লামেন্টের আদর্শে শিক্ষাব্যাপারে কোম্পানির নিরপেক্ষ থাকাই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। কিন্তু কোম্পানির পূর্বোক্ত কর্মচারীরা এ যুক্তি মেনে না নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। এদিকে মিশনারীদের সঙ্গেও কোম্পানির বিরোধ বাধল। এতদিন পর্যন্ত কোম্পানি মিশনারীদের শিক্ষাপ্রসারের কাজে যতদূর সম্ভব সাহায্য করে এসেছিল; কিন্তু রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পর কোম্পানি মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের সহায়তা করতে আর সাহস করল না। দেশের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে রাজ্যবিস্তারে বাধা ঘটাতে পারে এই ভয়ে কোম্পানি মিশনারীদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। মিশনারীরাও সহজে এটা মেনে নিলেন না। অবশেষে বহু আন্দোলনের পর ১৮১৩ সালের আইনে এদেশের শিক্ষার জন্যে কিছু ব্যয় বরাদ্দ করতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজী হল। এভাবে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ শুরু হল। ওদিকে মিশনারীদেরও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রসারের সুযোগ কোম্পানিকে দিতে হয়েছিল।

১৮১৩ সাল থেকে শিক্ষাজগতে আবার নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। এর আগে পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে কোম্পানির কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। এবার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল নব্য শিক্ষা কি ধরণের হবে? মেকলে প্রমুখ ব্যক্তিরা চাইলেন পাশ্চাত্য কৃষ্টিকে ভারতীয় কৃষ্টির স্থলাভিষিক্ত করে প্রথমে দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করতে। পরে এরাই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে এই ভাবে অপরদিকে হেষ্টিংস ও মিণ্টোর অনুগামী কোম্পানির কর্মচারীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংযোগ সাধন করতে চাইলেন। তাঁরা অনেকেই সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি ভাষা লিখেছিলেন এবং এদেশের জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচয়ও পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা এদেশের কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করতে পারেন নি। দেশের জনসাধারণও বুঝেছিল শুধু প্রাচীন শাস্ত্রের অনুশীলন অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষার হুবহু অনুকরণ করলে আর চলবে না। তাই তারাও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার সমন্বয়ে নিজেদের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি সৃষ্টি করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করল। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন ভাষার মাধ্যমে দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া হবে? বোম্বাইয়ের গভর্ণর এলফিন্‌ষ্টোন্ এবং অন্য দু'একজন ছাড়া সে সময় প্রায় সকলেই স্থির করেছিলেন শিক্ষা দিতে হবে হয় ইংরেজীতে না হয়, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি যে কোন একটি ভারতীয় প্রাচীন ভাষার সাহায্যে। কথ্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা প্রায় কেউ সমর্থন করলেন না। এছাড়া আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হল সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে। সেটি হচ্ছে, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটির সাহায্যে সহজে ও স্বল্পব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া যাবে?

১৮৫৪ সালে উডের ডেস্‌প্যাচে সাময়িকভাবে এ সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়েছিল। এতে স্থির হল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার

শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হলেও উচ্চশিক্ষাস্তরে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের জন্যে উৎসাহ দেওয়া হবে। শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে বলা হল মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ও কথ্য ভাষা উভয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। উডের ডেস্‌প্যাচেই স্থির হল সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ বেসরকারী কর্মীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এবং সরকার শুধু প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য করবেন। কারণ শিক্ষার সকল ব্যয়ভার বহন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হল অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণের শিক্ষার ভার রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলেই গণ্য হবে।

উডের ডেস্‌প্যাচে দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিষয় কিছুই বলা হয় নি। প্রথমে মনে হয়েছিল এগুলির উপযুক্ত সংস্কার করে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কার্যতঃ তা'হল না। তৎকালীন একশ্রেণীর কর্মচারী এগুলির বিলোপ সাধন করতে চাইলেন। ওদিকে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করা হল যারা সরকারী বিদ্যালয় থেকে পাশ করবে তাদের চাকরী দেওয়া হবে। ফলে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা সকলেই এই নতুন বিদ্যালয়ে যেতে লাগল। আর প্রাচীন পাঠশালা, মক্তব প্রভৃতির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল।

শিক্ষাপ্রসারের কাজে মিশনারীদের কতটা স্বাধীনতা থাকবে সে বিষয়েও ডেস্‌প্যাচে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। সরকারী কর্মচারীরা নানাভাবে মিশনারীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। মিশনারীরাও এর বিরুদ্ধে আবার তুমুল আন্দোলন শুরু করলেন। ফলে, বিরোধের মীমাংসা করার জন্যে ১৮৮২ সালে শিক্ষাকমিশন বসল এবং স্থির হল শিক্ষার ভার মিশনারীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে সরকারের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সমীচীন হবে না। শিক্ষাপ্রসারের কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে

গৌণভাবে মিশনারীরা কাজ করবেন। কমিশনও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে ক্রমে বেসরকারী কর্মকর্তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকারের পক্ষে শুধু অর্থ সাহায্য করাই যথেষ্ট মনে করলেন। প্রাদেশিক সরকাররা এই সুপারিশ অনুসারে কাজ করতে লাগলেন এবং বিশ বছরের মধ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির এত উন্নতি হয়েছিল যে এগুলি ছাড়া অন্য উপায়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার সম্ভব হতে পারে একথা তখন কেউ চিন্তা করতেও পারতেন না।

১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত বিশবছর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের স্মরণীয় সময়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, মর্লি-মিণ্টো পরিকল্পিত শাসন সংস্কারের প্রচেষ্টা, বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাগুলি এসময়ে একের পর এক ঘটতে থাকায় দেশে রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে একটা অসন্তোষের সূচনা দেখা দিয়েছিল। প্রচলিত অন্য সব ব্যবস্থার মত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিও লোকে বিরূপ হয়ে উঠল। ওদিকে সরকারী কর্মচারীরা মনে করলেন শিক্ষাকমিশনের সুপারিশের পর শিক্ষার গুণগত কোন উন্নতিই হয় নি। শিক্ষার যা উদ্দেশ্য নরনারীকে চরিত্রবান করে তোলা তা'হচ্ছে না। অতএব এ পদ্ধতির পুনর্গঠন প্রয়োজন। আর এর জন্যে চাই শিক্ষাব্যবস্থার সরকারী নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়দের ধারণা ছিল অন্য রকম। তাঁরা মনে করলেন শিক্ষার উন্নতি অপেক্ষা তাড়াতাড়ি এবং অধিক সংখ্যায় দেশের জনসাধারণকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই সহজে দেশের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাবে। এ নিয়ে আবার বচসার সৃষ্টি হল এবং যাঁরা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার চেয়েছিলেন তাঁরাই বার বার পরাজিত হতে লাগলেন।

শেষে যখন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্যে গোখ্লের বিল অধিক-সংখ্যক সভ্যের ভোটের জোরে নাকচ হয়ে গেল তখন সরকারী প্রচেষ্টাকে জনসাধারণ আর ভালভাবে গ্রহণ করতে পারলে না। জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিজেদের হাতে পাবার জন্যে দাবী জানালেন। তারই ফলে ১৯২১ সালে শিক্ষাদপ্তর নবনির্বাচিত ভারতীয় মন্ত্রীদের হস্তগত হল।

রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পর বেশ একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টায় রত হলেন। নতুন নতুন পরিকল্পনার সৃষ্টি হতে লাগল এবং শিক্ষার জন্যে অধিক অর্থও মঞ্জুর করা হল। কিন্তু পরিকল্পনানুযায়ী কাজ শুরু হবার আগেই আর এক বিপত্তি দেখা দিল। জগতের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভারতসরকার এদেশের শিক্ষার জন্যে যে অর্থ সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন তা, সহসা বন্ধ করে. দিলেন। ফলে, শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ ব্যয়ও হ্রাস করতে হল। আর্থিক গোলযোগ ছাড়াও শিক্ষার গুণগত উন্নতি ও তার বিস্তার সাধন নিয়ে পুরনো বিতর্ক ১৯২৯ সালে নতুন ভাবে দেখা দিয়ে শিক্ষাপ্রসারের বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। ১৯৩৭ সালে ভারতের এগারটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশের শাসন-ভার যখন কংগ্রেসের হাতে এল তখন পুরনো সব বিতর্কের অবসান হয়ে নতুন উদ্যমে আবার শিক্ষা সংস্কারের কাজ আরম্ভ হল।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনবছরের মধ্যে শিক্ষার জন্যে বহু অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা হতে লাগল। এই সময়েই লোকশিক্ষার জন্যে ওয়ার্ধাপরিকল্পনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কোন পরিকল্পনাই কাজে পরিণত হতে পারেনি।

১৯৪০-৪৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষার জন্যে নতুন কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। কংগ্রেস মন্ত্রীরা যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন সেগুলিই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মাত্র। এসময়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে শিক্ষা-ব্যাপারের জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাউপদেষ্টা সমিতির যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা। পরিকল্পনাটি সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এর পর ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আবার শাসনভার গ্রহণ করে শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তখন দেশে স্বাধীনতা লাভের জন্যে আন্দোলন চলছে। শিক্ষার পুনর্গঠনের দিকে মন দেবার অবসর ও সুযোগ কোনটাই ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ জাতি ভারত ত্যাগ করল আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের শিক্ষার ইতিহাসেরও যবনিকাপাত হল।

—এক—

ব্রিটিশ আগমনের প্রারম্ভে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

ইংরেজরা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখনও আমাদের প্রাক্তন শিক্ষাব্যবস্থাই চলছিল। এমন কি যখন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয় তখনও দেশের টোল, চতুষ্পাঠীগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় নি। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, মক্তবের সাহায্যে লোকশিক্ষার প্রসার হচ্ছিল। সে সময় প্রাচীন পদ্ধতিকে অবজ্ঞা না করে যদি ওর সাহায্যে নব্য ভাবধারার প্রসারের চেষ্টা করা হত তা'হলে লোকশিক্ষা দেবার কাজটা অনেক সহজ হয়ে উঠত। দেশের ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দিলে দেশবাসীও সহজে তা গ্রহণ করতে পারত। লর্ড ময়রা, টমাস মন্‌রো, এলফিন্‌ষ্টোন্ প্রভৃতি রাজকর্মচারীরা এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন। কিন্তু সরকার সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাঁরা প্রাচীন প্রথাকে অত্যন্ত হীন চোখে দেখতেন। তার ওপর যখন মেকলের হাতে এদেশের শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণের ভার পড়ল তখন তিনি অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলে প্রাক্তন পদ্ধতিকে আরও হেয় প্রতিপন্ন করলেন এবং ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে মত দিলেন। দেশের গভর্ণমেণ্টও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে প্রাচীন প্রথার বিলোপ সাধন করে নব্য শিক্ষাধারা প্রবর্তনের জন্যে মন স্থির করলেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তা' থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিই অতটা নিন্দনীয় ছিল না। ব্রিটিশ আমলে এদেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির তিনবার উল্লেখযোগ্য অনু-

সন্ধান করা হয়েছিল। প্রথম মাদ্রাজে টমাস মন্‌রো ১৮২২ সালে দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা কি ধরণের ছিল জানবার জন্যে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। এরপর বোম্বাই ও বাংলাতেও অনুরূপ অনুসন্ধান হয়েছিল। বাংলা দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন উদারহৃদয় মিশনারী—আডম। তিনি প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই দেশের শিক্ষার অবস্থা জানার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে একে নব্য শিক্ষা প্রসারের কাজে লাগানো যায় সে বিষয়েও চিন্তা করে তিনি তাঁর রিপোর্টের তৃতীয় অংশে এ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তাবও করেছিলেন। ঐ সকল অনুসন্ধানের রিপোর্ট থেকে সেকালের শিক্ষার সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় এ অধ্যায়ে আমরা তাই আলোচনা করব।

তখন শিক্ষার প্রাথমিক ও উচ্চ—এই দুটি স্তরই ছিল। টোল, চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসাতে উচ্চশিক্ষার অনুশীলন হত আর পাঠশালা এবং মক্তব ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র।

এখনকার বিদ্যালয় গৃহের মত তখন পাঠশালার নিজস্ব গৃহ বলতে কিছু ছিল না। ধনী লোকেদের চণ্ডীমণ্ডপে, কোন কোন দেবালয়ের একাংশে অথবা গুরুমশাইয়েরই গৃহের একদিকে পাঠশালা বসত। যখন তাও জুটতো না তখন ছেলেরা গাছের তলায় বসেই গুরুমশাইয়ের কাছে পড়াশুনা করত। পাঠশালায় আসবাবপত্রের বালাই ছিল না। ছেলেরা পাততাড়ি বগলে করে পড়তে আসত, পড়া হয়ে গেলে পাততাড়ি নিয়েই বাড়ী ফিরত। পাঠ্য বিষয় ছিল সামান্য। কিছু লেখা ও পড়া এবং জমাখরচের হিসেব রাখা, এইটুকুই পাঠশালায় শেখান হত। পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ির পর ছেলেদের লেখা পড়া শুরু হত তারপর চারপাঁচ বছরের মধ্যে কোনোমতে রামায়ণ মহাভারত পড়তে, চিঠিপত্র লিখতে এবং হিসেব

করতে পারলেই সেকালের ছেলেদের লেখা পড়া শেখা হয়ে যেত। দশবছর বয়সের বেশী বড় একটা কেউ পাঠশালায় পড়তে যেত না। দু'একজন ধনীলোকের ছেলে অবশ্য চোদ্দ পনের বছর পর্য্যন্তও পড়াশুনা করত। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প।

পাঠশালা বসবার অথবা ছুটি হবার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম বলে কিছুই ছিল না। গুরুমশাইয়ের সুবিধে অসুবিধে মত পাঠশালার কাজ আরম্ভ ও শেষ হত। এখনকারমত সপ্তাহে এবং বছরে নির্দিষ্ট ছুটির ব্যবস্থা না থাকলেও পূজাপার্বণে, দোলদুর্গোৎসবে পাঠশালা বন্ধই থাকত। আবার গুরুমশাইয়ের বাড়ীতে বিয়ে, পৈতে প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠান থাকলেও পাঠশালার পড়াশুনা হত না। এ সব উপলক্ষে সময় সময় এক সঙ্গে সাত আট দিনও পাঠশালার ছুটি থাকত।

পাঠশালার গুরুগিরি সাধারণতঃ ব্রাহ্মণরা করতেন। অবশ্য উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র টোল চতুষ্পাঠীর মত এতে ব্রাহ্মণদের এক-চেটিয়া অধিকার ছিল না। বহু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিও পাঠশালার গুরুমশাই হতেন। তবে তাঁরা কেউই পয়সার জন্যে এ কাজ করতেন না। তখন বিদ্যাদান করার একটা আলাদা গৌরব ছিল। সেই গৌরবলাভের জন্যেই তাঁরা অন্যান্য কাজের সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর কাজও করতেন। পাঠশালায় বেতন দেবার ব্যবস্থা থাকলেও বেতন দেবার নির্দিষ্ট কোন রীতি ছিল না। যার যেমন খুশী বা সাধ্য সে সেই রকম মূল্য দিত লেখাপড়া শেখবার জন্যে। কোন ছেলে হয়ত গুরুমশাইকে চাল ডাল প্রভৃতি দিত, আবার কেউ বা পয়সাই দিত। গুরুমশাইয়ের আপত্তি করবার কিছু ছিল না। তখনকার গুরুমশাইরা মাসে তিনটাকা থেকে পাঁচটাকার বেশী রোজগার করতেন না। কিন্তু তাঁদের অভাবও ছিল না। কারণ

প্রথমতঃ তখন দেশের যা অবস্থা ছিল তাতে মাসিক পাঁচ ছ'টাকায় রাজার হালে থাকা যেত। তাছাড়া পূজাপার্বণ, বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গুরুমশাইদের পাওনা হিসেবে ধুতি, গামছা, শাড়ী এবং অর্থদক্ষিণা বরাদ্দ থাকত। সুতরাং আজকালকার মাষ্টারমশাইদের তুলনায় তাঁদের দুশ্চিন্তা ছিল অনেক কম।

পড়ানোর পদ্ধতিও বেশ সাদাসিদে ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সকালে পাঠশালা বসত। সব ছেলেরা জড় হলে তাদের বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে দুটি ভাগ করে উঁচুশ্রেণীর ছেলেদের ওপর ছোট ছোট ছেলেদের পড়ানোর ভার দেওয়া হত। তাতে গুরুমশাইদের কাজ যেমন অনেকটা কমে যেত তেমনই বড় ছেলেদের পড়া ভাল ভাবে আয়ত্ত হয়ে যেত। একেই "সর্দারপোড়ো" প্রথা বলা হত। (ডঃ বেল যখন মাদ্রাজে মিশনারীর কাজ নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি এই শিক্ষাধারার বিশেষ উপযোগিতা দেখে নিজের দেশে গরীব ছেলেদের স্বল্পব্যয়ে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে এই প্রথা স্বদেশে প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন)। বড় ছেলেদের কিন্তু গুরু-মশাই নিজে পড়াতেন। ছোট ছোট ছেলেদের আগে বালি, শ্লেট অথবা কাগজের ওপর আঙুল দিয়ে অক্ষর লিখতে শেখানো হত। এরকম ভাবে লিখতে লিখতে অক্ষর চিনতে পারলে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন-বর্ণ, যুক্তাক্ষর প্রভৃতির পার্থক্য বুঝিয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। মাদ্রাজের রিপোর্টে বলা হয়েছে তখন উচ্চারণ করে পড়ে অক্ষর-জ্ঞান করাবার রীতি ছিল না। ছাপা বইয়েরও তখন প্রচলন হয় নি। ছেলেরা গুরুর মুখ থেকে শুনে গ্রাম, নদী, মানুষ, জন্তু-জানোয়ারের নাম মুখস্থ করত। এভাবে লেখা ও পড়া কতকটা আয়ত্ত হলে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি অঙ্ক শেখানোর জন্যে ছেলেদের নামতা মুখস্থ করানো হত। এ ছাড়া পাঠশালায় গুরু-

মশাই কখন পৌরাণিক গল্প বলতেন ছেলেদের কখনও বা দু'একটা প্রচলিত ছড়া মুখস্থ করতে দিতেন। আবার অনেক সময় হাতের লেখা নকল করতে শেখানো হত। এখনকার তুলনায় পাঠশালার পড়া সামান্য হলেও তখনকার উপযোগী ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্যে পাঠশালার পড়াশুনাই যথেষ্ট ছিল। কারণ পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করতে পারলেই তখন জমিদারী সেরেস্তায় বা ব্যবসাদারের গদিতে চাকরী পাওয়া যেত। সে জন্যে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাই পাঠশালায় পড়তে যেত। হিন্দুমুসলমান উভয় শ্রেণীর ছেলেরাই সেখানে পড়ত। অবশ্য মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থাও ছিল, হিন্দুছেলেরা বড়কেউ মুসলমানদের মক্তবে পড়াশুনা করতে যেত না। মক্তবে ফারসী ভাষায় পড়ান হলেও সময় সময় হিন্দুস্থানীও পড়ান হত। পাঠশালায় কিন্তু বাংলা অথবা স্থানীয় কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ফারসী তখন রাজভাষা হলেও তা, শেখানো হত না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিল না বল্লে হয়, তাই একআধজন ছাড়া প্রায় কোন মেয়েই পাঠশালায় যেত না; বাড়ীতে তারা একটু আধটু লেখাপড়া শিখত। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে কোন জাত বিচার ছিল না। সকল বর্ণের ছেলেরাই পাঠশালায় পড়তে যেত। তবে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কিছু বেশী প্রায় সব পাঠশালায় থাকত। তার কারণ হাড়ি, বাগদি, মুচি, বাউরি প্রভৃতি তথাকথিত নীচুজাতির ছেলেরা অনেক অল্প বয়সে নিজেদের জাতব্যবসায় করতে শুরু করত। পড়াশুনার প্রয়োজন তাদের কিছুই ছিল না।

পাঠশালার গুরুমশাইদের পড়াবার যোগ্যতা খুবই সামান্য থাকত। একটু ভাল উচ্চারণ করে পড়তে পারলে. হাতের লেখা

ভাল হলে এবং নামতায় দক্ষতা থাকলে যে কেউ এ কাজ করত। তবে সেকালের পাঠ্যবিষয়ের তুলনায় গুরুমশাইদের এটুকু যোগ্যতাই যথেষ্ট বলতে হবে। পাঠশালার শাস্তি দেবার রীতিও ছিল খুব কঠোর। ছেলেকে মেরে ধরে মানুষ করার পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণ করা হত। অনেক সময়ে লঘু পাপে গুরু দণ্ডও দেওয়া হত।

এই ত গেল তখনকার পাঠশালার অবস্থা। দেশের স্থানে স্থানে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র টোল মাদ্রাসাও বহু ছিল। এসব জায়গায় শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা হত। অধ্যাপকরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত। শাস্ত্রপুরাণের জ্ঞান তাঁদের ছিল অগাধ। তাঁরা অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদানের কথা ভাবতেই পারতেন না। তখন উচ্চ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। পাঠশালায় তবু সাধ্য ও ইচ্ছেমত বেতন দেবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এখানে ছাত্ররা বিনা বেতনেই পড়াশুনা করত। এমন কি যে সব ছাত্র দূর দূর দেশ থেকে পড়তে আসত তাদের খাওয়া থাকার কথাও ভাবতে হত না। অধ্যাপকরাই সে সব ব্যবস্থা করে দিতেন। এখানকার শিক্ষা বৃত্তিমূলক ছিল না। বেশীরভাগ ছেলেই টোল চতুষ্পাঠীতে পড়তে আসত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে। তাই অধ্যয়ন শেষ করবার তাড়া ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রয়া শাস্ত্রাদির চর্চায় রত থাকত। অবশ্য দু'এক জন যাজন অথবা অধ্যাপনা করত। মুসলমান পরিবারের ছেলেরা মাদ্রাসা মক্তবে যেত উচ্চশিক্ষার অনুশীলনের জন্যে। তবে বড়লোকের ছেলেরা প্রায় বাড়ীতে আখনজী রেখে লেখাপড়া শিখত।

এসব উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে ধর্ম, শাস্ত্র প্রভৃতির চর্চা হত বলে রাজারা ও ধনীব্যক্তিরা এগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য করতেন। তখন প্রত্যেক রাজা এবং ধনীব্যক্তি উচ্চশিক্ষার

পৃষ্ঠপোষণ করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করতেন। কিন্তু তা'বলে টোল চতুষ্পাঠীর পরিচালনায় কর্তৃত্ব করতে যেতেন না। সেখানে অধ্যাপকদের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। নিজেদের প্রয়োজন ও ইচ্ছেমত ব্যবস্থা তাঁরা করতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা ব্রহ্মোত্তর ভোগ করতেন। পূজা পার্বণে দক্ষিণা বিদায়ীও পেতেন। তাছাড়া যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তিও লাভ করতেন।

উচ্চ শিক্ষা ছিল সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যে। আর পাঠশালায় সর্বসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। তাই তখন গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিল। বড় বড় গ্রামে আবার পাঁচ ছ'টা পাঠশালাও থাকত। আডমের রিপোর্ট থেকে জানা যায় এক বাংলা দেশেই তখন এক লক্ষ পাঠশালা ছিল। উচ্চশিক্ষার প্রসার তত বেশী ছিল না। তাই নবদ্বীপ, মিথিলা. বিক্রমপুর, কাশী প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রাদির চর্চার এবং দিল্লী, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে আরবী ফারসীর সাহায্যে মুসলিম সংস্কৃতির অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল। দূর দূর দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত।

এই হল সেকালের শিক্ষার অবস্থা। পড়ার বিষয় ছিল অল্প সন্দেহ নেই। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান কিছু তখন পড়ান হত না। তার কারণ সে প্রয়োজন তখন ছিল না। কিন্তু শিক্ষা দেবার পদ্ধতি যে খারাপ ছিল না টমাস মনরো তাঁর রিপোর্টে সে-কথা বলে গেছেন। তাঁর মতে ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য যে কোন স্থানের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ভারতের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা অনেক ভাল ছিল।

এবার সেকালে শিক্ষার হার কি রকম ছিল দেখা যাক। মাদ্রাজের রিপোর্টে বলা হয়েছে তখন মাদ্রাজের জনসংখ্যার তুলনায়

শিক্ষিতের হার ছিল ১'৬৭। মেয়েরা প্রায় কেউ তখন পড়াশুনা করত না। তাই তাদের সংখ্যা বাদ দিলে সে সময় মাদ্রাজে পাঁচশো জনের জন্যে একটি করে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল বলা যায়। বোম্বাইয়ের রিপোর্টেও অনুরূপ হিসেব দেওয়া হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে আডমের রিপোর্ট অধিক নির্ভরযোগ্য। তাই বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান করে আডম যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন এখানে আমরা তারই আলোচনা করব। তখন বাংলা দেশ বলতে বাংলা ও বিহার বোঝাত। এই দুই প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল চার কোটি (৪,০০,০০,০০০) আর আডমের হিসেব মত পাঠশালা ছিল এক লক্ষ (১,০০,০০০)। অর্থাৎ চারশ' জনের জন্যে একটী করে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। অবশ্য আডম শিক্ষাকেন্দ্র বা বিদ্যালয় কথাটি আধুনিক অর্থে ব্যবহার করেন নি। তিনি যেখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা দেখেছেন তারই উল্লেখ করেছেন তাঁর রিপোর্টে। তাই তাঁর প্রদত্ত তালিকা থেকে গৃহে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থার কথাও বাদ যায় নি। তখন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর থানায় সাতাশটি পাঠশালা ছিল, এর মধ্যে দশটি পাঠশালায় বাংলা ভাষার সাহায্যে ছেলেদের লেখাপড়া শেখান হত। মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ফারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এ ধরণের পাঠশালা ছিল চারটি। তাছাড়া কোরাণ শিক্ষা দেবার জন্যে আরও এগারটি এবং একই সঙ্গে বাংলা ও ফারসী শেখান হত এমন দুটি পাঠশালা ছিল। এগুলিতে সবশুদ্ধ ২৬২ জন ছাত্র পড়াশুনা করত। নাটোরে তখন মোট ৬,১২১ জন লোক ছিল শিক্ষিত। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে যারা শুধু মাত্র নিজের নামটা কোন রকমে লিখতে পারত তাদেরও ধরা হয়েছে।

নাটোরের অনুসন্ধান শেষ করবার পর আডম আরও পাঁচটি জেলার শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন। নিম্নে সেই পাঁচটি জেলার—মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও ত্রিহুত, বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যার যে তালিকা আডম দিয়েছেন নীচে তা' থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এথেকে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা ধারণা আমরা করতে পারব।

১। পাঁচটি জেলার বিদ্যালয়ের সংখ্যা:—

জেলা	বাংলা	হিন্দী	সংস্কৃত	ফারসী	ফরমালে আরবী	আরবী	ইংরেজী	বালিকা	সমষ্টি
মুর্শিদাবাদ	৬২	৫	২৪	১৭	...	২	২	১	১১৩
বীরভূম	৪০৭	৫	৫৬	৭১	...	২	২	১	৫৪৪
বর্দ্ধমান	৬২৯ + ১ (শিশুদের)	...	১৯০	৯৩	৩	৮	৩	৪	৯৩১
দক্ষিণ-বিহার	...	২৮৬	২৭	২৭৯	...	১২	১	...	৬০৫
ত্রিহুত	...	৮০	৫৬	২৩৪	...	৪	...	...	৩৭৪
সমষ্টি	১,০৯৯	৩৭৬	৩১৩	৬৯৪	৩	২৮	৮	৬	২,৫৬৭

২। ছাত্রের সংখ্যা :—

জেলা	বাংলা ও হিন্দী	সংস্কৃত	ফারসী ও আরবী	ইংরেজী	বালিকা	সমষ্টি
মুর্শিদাবাদ	১,০৮০	১৫৩	১০৯	২৬	২৮	১,৩৯৬
বীরভূম	৬,৩৮৩	৩৯৩	৪৯০	৭৩	১১	৭,৩৫০
বর্দ্ধমান	১৩,১৯০	১,৩৫৮	৯৭১	১২০	১৭৫	১৫,৮১৪
দক্ষিণ-বিহার	৩,০৯০	৪৩৭	১,৪৮৬	২৩	...	৫,০৩৬
ত্রিহুত	৫০৭	২১৪	৫৯৮	...	...	১,৩১৯
সমষ্টি	২৪,২৫০	২,৫৫৫	৩,৬৫৪	২৪২	২১৪	৩০,৯১৫

এই দুটি তালিকা ছাড়া আডম আরও দুটি তালিকায় সেকালে গৃহে আখনজী ও পণ্ডিত রেখে ছেলেদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কি রকম ছিল এবং তখন গৃহে ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত মোট বিদ্যার্থীর সংখ্যা কত ছিল তার হিসেবও দিয়েছেন। সে তালিকা দুটিও উদ্ধৃত হল।

৩। বিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র এবং গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থাঃ—

স্থান	জনসংখ্যা	সহর ও গ্রামের সংখ্যা	ফারসী বিদ্যালয় সমেত প্রাথমিক বিদ্যালয়	উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র	অন্যান্য বিদ্যালয়	গৃহ শিক্ষার ব্যবস্থা	সমষ্টি	৪০০ জনের জন্য একটী করে বিদ্যালয় ছিল এই অনুমানের ভিত্তিতে বিদ্যালয় সংখ্যা
মুর্শিদাবাদ (সহর)	১২৪,৮০৪	…	৫৯	২৬	৩	২১৬	৩০৪	৩১২
দৌলতবাজার (থানা)	৬২,০৩৭	১৮৩	২৫	…	…	২৫৪	২৭৯	১৫৫
নাঙ্গলিয়া ,,	৪৬,৪১৬	২৬৭	৩৪	২	…	২০৭	২৪৩	১১৬
কালনা ,,	১১৬,৪২৫	২৮৮	৭৯	৩৮	২	৪৭৫	৫৯৪	২৯১
জেহানাবাদ ,,	৮১,৪৮০	৮০৩	৮৫	৭	…	৩৬০	৪৫২	২০৩
ভাওয়ারা	৬৫,৮১২	৪০২	৬	৭	…	২৩৫	২৪৮	১৬৪
সমষ্টি	৪৯৬,৯৭৪	১,৯৪৩	২৮৮	৮০	৫	১,৭৪৭	২,১২০	১,২৪১

৪। গৃহে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা :—

স্থান	জনসংখ্যা	বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা	গৃহে শিক্ষিতদের সংখ্যা	উভয়বিধ ছাত্রের সমষ্টিগত সংখ্যা
মুর্শিদাবাদ সহর	১২৪,৮০৪	৯৫৯	৩০০	১,২৫৯
দৌলতবাজার (থানা)	৬২,০৩৭	৩০৫	৩২৬	৬৩১
নাঙ্গলিয়া ,,	৪৬,৪১৬	৪৩৯	২৮৫	৭২৪
কালনা ,,	১১৬,৪২৫	২,২৪৩	৬৭৬	২,৯১৯
জেহানাবাদ ,,	৮১,৪৮০	৩৬৬	৫৩৯	৯০৫
ভাওয়ারা	৬৫,৮১২	৬০	২৮৮	৩৪৮
সমষ্টি ...	৪৯৬,৯৭৪	৪,৩৭২	২,৪১৪	৬,৭৮৬

এই সব তথ্য যখন সংগ্রহ করা হয় তখন দেশের অবস্থা যে রকম ছিল তাতে সঠিক হিসেব পাওয়া সম্ভব হয়নি। গভর্ণমেণ্টের কোন কাজকেই লোকে ভাল চোখে দেখত না। আবার অনেক সময় সরকারী লোকের কাছে নিজেদের সব অবস্থা বলতে ভয়ও পেত। সেজন্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কতকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে একটা হিসেব দেওয়া হয়েছে। যা পাওয়া গেছে তা থেকেই নিঃসন্দেহে বলা যায় সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে নিলে তাইই এককালে লোকশিক্ষার প্রধান সহায় হতে পারত। আডম এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন এবং কিভাবে এগুলির সংস্কার করা যায় সে পরামর্শও দিয়েছিলেন।

এর জন্যে সাতটি মূল্যবান প্রস্তাব তিনি করেন, যেমন—

(১) প্রথমে দু'একটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করতে হবে।

(২) এই জেলাগুলির শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

(৩) ছাত্র ও শিক্ষকের জন্যে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় পুস্তক রচনা করতে হবে।

(৪) পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করবার জন্যে একজন পরীক্ষক বা কার্যনির্বাহক কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার দায়িত্ব তাঁর ওপর থাকবে।

(৫) বই পড়তে যাতে উৎসাহ পান সেজন্যে গুরুমশাইদের পরীক্ষা নিতে হবে ও যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কারও দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) আবার গুরুমশাইরা যাতে পরীক্ষা নিয়ে এবং পুরস্কৃত করে ছেলেদের নতুন জ্ঞান দান করতে পারেন সেবিষয়েও তাঁদের উৎসাহ দিতে হবে।

(৭) গ্রামে থেকে শিক্ষকতা করতে যাতে অসুবিধে না হয় সেজন্যে বিদ্যালয়ে জমি দান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আডমের প্রস্তাবের কোন মূল্য তখনকার গভর্ণমেণ্ট দিলেন না। বড়লাট বেণ্টিক তখন মেকলের পরিস্রুতি নীতি (Filtration Theory) অনুযায়ী দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করাই ঠিক বলে মেনে নিয়েছিলেন। এদেশের জনসাধারণের মধ্যে নতুন জ্ঞান এঁরাই দান করবেন। এই বলে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজেদের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

———

—দুই—

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ।

ভারতে আগমনের প্রায় একশ' বছর পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের শিক্ষাসম্বন্ধীয় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। প্রথম দিকে অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের পরাভূত করতে এবং তারপর দেশীয় রাজ্যগুলিকে একের পর এক অধিকার করে রাজ্য বিস্তার করতেই বেশীর ভাগ সময় কেটেছে কোম্পানির। অবশ্য ১৬৯৮ সালে নিজের এলাকায় কোম্পানি কতকগুলি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু আসলে এগুলি করা হয়েছিল কোম্পানিরই ইউরোপীয় কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা তখনও ওঠে নি। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে পাদরীরা চাঁদা তুলে এ্যংলোইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের জন্যে কতকগুলি চ্যারিটি স্কুল খুলল। আর কোম্পানি এগুলির পৃষ্ঠপোষণ করতে লাগল।

তারপর যখন ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি নিয়ে কোম্পানি এদেশের ওপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করল তখন থেকেই ভারতের অন্য সব ব্যবস্থার মত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও তাদের নজর দেওয়া উচিত বলে কোম্পানির বিজ্ঞ কর্মচারীরা মনে করতে লাগলেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণের চেষ্টা করা হতে লাগল। ১৭৯৩ সালে কোম্পানির সনন্দ নতুন করে দেবার সময় সরকারী সাহায্যে এদেশে মিশনারী ও শিক্ষক পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতে রাজী হলেন না। কথাটা সে সময় চাপা পড়ে গেল। তখন কোম্পনির পূর্বোক্ত কর্মচারীরা রাজনৈতিক যুক্তি দেখাতে লাগলেন। তাঁরা বল্লেন এদেশে হিন্দুমুসলমান রাজারা বরাবর শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা

করে গেছেন। শাসক হিসেবে কোম্পানিরও আর এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকা উচিত নয়। এইসব কর্মচারীরা প্রায় সকলেই প্রাচ্যবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁরা এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রাদির অধ্যাপনার জন্যে অর্থব্যয় করা সমীচীন বলে মনে করলেন। তাঁরা আরও বল্লেন যে এভাবে প্রাচ্য বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করলে দেশের হিন্দুমুসলমান নেতারা খুশী হবেন। রাজ্য হারাবার ভয়ও কমে যাবে।

এবার গভর্ণমেণ্ট তাঁদের পরামর্শ আর অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ১৭৮১ সালে কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মুসলিম সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্যে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। এর কয়েকবছর পরে ১৭৯১ সালে হিন্দুদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে কাশীতেও একটি সংস্কৃত কলেজ খোলা হল। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য হল জজপণ্ডিত ও মৌলবী তৈরী করা। ইংরেজ জজদের এদেশের আইন জানা না থাকায় বিচার কার্যে খুব অসুবিধে হত। সে জন্যে স্থির হল যারা মাদ্রাসায় ও সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করবে তাদের ইংরেজ জজদের কাছে দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করবার জন্যে নিয়োগ করা হবে। তাই একরকম প্রায় বিনা বেতনেই ছাত্রদের পড়ান হত। ফল ভালই হল। এতে বিনা বেতনে বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনা করা যাবে তার ওপর আবার চাকরীও এক রকম বাঁধা রইল। হিন্দু-মুসলমান নেতারা সত্যি খুসী হলেন এবং বহু ছেলে এই দুটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করতে লাগল। সরকারও মুক্তহস্তে প্রতিষ্ঠানদুটিকে অর্থসাহায্য করতে লাগলেন। মাদ্রাসার জন্যে বার্ষিক ত্রিশ হাজার ও সংস্কৃত কলেজের জন্যে বিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হল। এইভাবে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে যতটা না হোক এদেশের ওপর অধিকার কায়েম করবার জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কোম্পানি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে মন দিল।

ওদিকে মিশনারীরাও জোর ধর্ম প্রচার এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করে চলেছেন। তাঁরা কোথাও আগে বিদ্যালয় স্থাপন করে তার ভেতর দিয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন, কোথাও বা আবার ধর্ম প্রচার করে স্বধর্মত্যাগীদের শিক্ষিত করে তোলবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় খুলতে লাগলেন। কোম্পানি বরাবর মিশনারীদের কাজ সমর্থন করেই এসেছে। কিন্তু এদেশের শাসনভার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারীদের প্রতি তাদের ব্যবহার বদলে গেল। কোম্পানি ছিল পাকা ব্যবসাদার। ভারতবাসীকে চটিয়ে এদেশের ওপর আধিপত্য করা সম্ভব নয় বুঝেছিল বলে প্রথম থেকে এদেশের লোককে খুশী করবার চেষ্টা করে এসেছে। অথচ মিশনারীরা যে ভাবে দেশের ধর্ম ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার নিন্দে করে ধর্মান্তর করে বেড়াচ্ছিল তাতে যে শীঘ্র বিদ্রোহের সৃষ্টি হবে সে বিষয়ও কোম্পানির সন্দেহ ছিল না। তাই এখন থেকে মিশনারীদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে কোম্পানি বাধ্য হল। উইলিয়াম কেরী যখন ১৭৯৯ সালে বাংলা দেশে আসেন তখন তাঁকে ধর্মপ্রচার করবার অনুমতি দেওয়া হল না। কেরী দিনেমারদের আশ্রয়ে শ্রীরামপুরে কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর আরও দু'জন সহকর্মী শ্রীরামপুরে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করলেন ধর্মপ্রচারের জন্যে। কিন্তু যখন এদেশের ধর্মের নিন্দে করে তাঁরা কতকগুলি প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন তখন কোম্পানি মিশনারীদের প্রতি আরও বিরক্ত হয়ে পড়ল। এ জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হল। এমন কি তাঁদের মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছিল, কিন্তু দিনেমারদের মধ্যস্থতায় তা' আর সম্ভব হয় নি। এভাবে মিশনারীদের সব কাজেই কোম্পানি বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। তার ওপর আবার ১৭৮১ সাল থেকে প্রাচ্য বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছিল। তার ফলে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত মিশনারীরা তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কাজ

করতে পারছিলেন না। তাঁরা নির্বিবাদে কোম্পানির নীতি মেনে না নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁদের তরফ থেকে উইলবারফোর্স পার্লামেন্টে আবেদন জানালেন কোম্পানির মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে এবং এদেশের জনসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আরও মিশনারী ও শিক্ষক পাঠান হোক এ প্রস্তাবও করলেন। কোম্পানির কর্মকর্তারা ওদিকে পার্লামেন্টকে বুঝিয়েছেন যে এদেশের ধর্মব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই মঙ্গল। তাই উইলবারফোর্সের আবেদনের কোন ফলই হল না। কোম্পানি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে মিশনারীদের কাজে বাধা দিতে শুরু করলেন। ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানির এলাকায় মিশনারীদের কোন রকম কাজের অনুমতি দেওয়া হল না। আর যাঁরা তা'সত্বেও ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন তাঁদের কোম্পানির এলাকা থেকে বার করে দেওয়া হতে লাগল।

এবার চার্লস গ্রাণ্ট এলেন মিশনারীদের হয়ে দু'কথা পার্লামেণ্ট তথা ইংরেজদের বোঝাবার উদ্দেশ্যে। প্রথমে মিশনারীসুলভ মনোবৃত্তিতে তিনি এদেশের দুরবস্থার কথা ইংরেজদের জানালেন। এখানকার লোকেদের ন্যায়নীতি বলে জিনিষটার যে কতখানি অভাব তাও বোঝাতে চেষ্টা করলেন। উপযুক্ত ধর্মের অভাব ও সেইসঙ্গে অশিক্ষাই যে এর কারণ সেকথাও স্পষ্ট করে বল্লেন। উপসংহারে জানালেন একমাত্র খ্রীষ্টের বাণী প্রচার এবং সেই সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দিলেই তবে এদেশের লোককে উদ্ধার করা যাবে। এছাড়া দেশীয় কুসংস্কার দূর করার জন্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতির উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক শিক্ষার প্রসারের জন্যেও গ্রাণ্ট সাহেব সে সময়ে প্রস্তাব করেছিলেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বহু ইঙ্গিত গ্রাণ্টের সুপারিশের মধ্যে নিহিত ছিল সে জন্যে

অনেকে তাঁকে নব্য শিক্ষার জনক বলে থাকেন। ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা এবং ধর্মসংক্রান্তব্যাপার ছাড়াও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী কৃষিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার কথা তিনি বহুপূর্বে বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন এদেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া ইংরেজের কর্তব্য। রাজ্য হারাবার ভয়ে সে কর্তব্য থেকে নিরত থাকা অনুচিত। তাছাড়া খ্রীষ্টধর্ম বশ্যতা স্বীকার করতে এবং সদ্ব্যবহার করতেই নির্দেশ দেয়। অতএব ভারতীয়রা খ্রীষ্টান হলে তাদের তরফ থেকে বিদ্রোহ সৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না।

অযথা এদেশের আচরণের নিন্দে করায় এবং ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরীকরণের সুপারিশ করার জন্যে প্রথমে গ্রান্টের প্রস্তাবের কোন মূল্য দেওয়া হল না। কিন্তু তিনি ছিলেন কোম্পানির একজন প্রভাবশালী পরিচালক আর বহু পূর্বে এদেশে এসে তিনি এখানকার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছেন পার্লামেণ্টের ধারণা। সেজন্যে তাঁর প্রস্তাব উইলবার-ফোর্সের প্রস্তাবের মত একেবারে বাতিল করা হল না। গ্রান্টের প্রস্তাব ১৮১৩ সালের আইনে অনেকটা মেনে নেওয়া হয়েছিল। মিশনারীরা গ্রান্টের প্রস্তাবের ওপর নির্ভর করে জোর আন্দোলন আরম্ভ করলেন।

অপরদিকে প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগীরাও দেখলেন শুধু মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের উন্নতির চেষ্টা করলেই যথার্থ প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে না। ব্যাপকভাবে এর প্রসার ঘটাতে হবে। বড়লাট মিণ্টো নিজে ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগী। তিনি ১৮১১ সালে এক স্মারক লিপিতে (Minute) এ বিষয়ের আলোচনা করে ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে এদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ইংরেজদেরও অনেক কিছু শেখবার আছে। অথচ সরকারের তরফ থেকে অবজ্ঞা অথবা উদাসীনতার দরুন এই বিপুল জ্ঞানরাশি ক্রমশঃ লোকলোচনের

অন্তরালে অপসৃত হচ্ছে। দেশে অধ্যাপক পণ্ডিতের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব শাসকহিসেবে ইংরেজদেরই। অতএব প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্যে উপযুক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হোক।

মিশনারী এবং প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী রাজকর্মচারী উভয়েই শিক্ষার জন্যে যাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দ হয় সেই উদ্দেশ্যে আন্দোলন করতে লাগলেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। একদল চাইলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে অর্থ, আর অন্য দলের উদ্দেশ্য এদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা।

শিক্ষাব্যাপারে মিশনারীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন এবং শিক্ষার জন্যে ব্যয় বরাদ্দ করার দাবী—এদুটির বহুলাংশে সুমীমাংসা হল ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানির সনন্দ পুনরায় নতুন করে দেওয়া হল।

মিশনারীরা এদেশে স্বাধীনভাবে শিক্ষা দেবার অধিকার পেলেন। কিন্তু এদেশের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা কোম্পানির কর্মকর্তারা সে সময়ও সমর্থন করলেন না। কারণ ইংলণ্ডে তখন পর্যন্ত শিক্ষা ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, রাষ্ট্র কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। যাই হোক, স্থির হল সম্পূর্ণ দায়িত্ব ঘাড়ে না নিলেও এদেশে প্রাচ্যবিদ্যার পরিপোষকতা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসারের উদ্দেশ্যে কোম্পানি বছরে এক লক্ষ টাকা খরচ করবে। অবশ্য এক লক্ষ টাকা ভারতের মত বিরাট দেশের উভয়বিধ শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের পক্ষে খুবই সামান্য, তবু কোম্পানির তরফ থেকে একেবারে নিরপেক্ষতা অপেক্ষা এব্যবস্থা অনেক ভাল মনে করা হল।

এইভাবে ১৮১৩ সাল থেকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ শুরু হয়। মিশনারীরাও নবীন উৎসাহে দলে দলে এদেশে এসে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নবা শিক্ষার প্রবর্তন করতে লাগলেন।

নব্য শিক্ষার প্রবর্তন।

(ক) সরকারী প্রয়াস

১৮১৩ সালে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার কোম্পানির ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন সমস্যা দেখা দিল। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে কোম্পানির কোন নীতি ছিল না। এখন কি ভাবে এদেশে শিক্ষার বিস্তার করা হবে, এই হল সমস্যা। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন করা হবে, না, প্রাক্তন পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করে বিদেশী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে? একমাত্র কোম্পানির একদল মুখ্যস্থানীয় কর্মচারী ছাড়া প্রায় সকলেই প্রাচীন পদ্ধতির অনুশীলন করার কথা সমর্থন করলেন না। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শিক্ষা এদেশের লোককে দিতে হবে, প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কার অথবা প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতির সমন্বয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই ছিল সেকালের শিক্ষাসংস্কারকদের মনের ভাব। তখনকার বহু দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিও এই মত সমর্থন করলেন এবং ১৮২১ সালে কোম্পানি যখন প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগীদের কথায় কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন, তখন তীব্র প্রতিবাদ করলেন। দেশের জনমতও তখন ইংরেজী শিক্ষার দিকে। কারণ ইংরেজী শিখলে আর্থিক উন্নতির আশা আছে। এমন সময় মেকলে এদেশে এলেন এবং তৎকালীন বড়লাট বেন্টিক মেকলের ওপর ভার দিলেন গভর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি নির্ধারণ করবার। তিনি প্রথমে দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদগুলি বার করে লোককে বোঝালেন যে দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তুলতে গেলে প্রাচীন ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করা চলবে না। ইংরেজীর সাহায্যে কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর ভারতবাসীকে ওদেশের ভাবধারায় পুরোপুরিভাবে শিক্ষিত করতে হবে। যারা শুধু নামে ও রঙেই ভারতবাসী থাকবে, কিন্তু আচার ব্যবহারে, ভাষায় ও সংস্কৃতিতে

হবে ইংরেজ। গভর্ণমেণ্টের সরাসরি জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই। ঐ সকল ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরাই সাধারণের মধ্যে নতুন জ্ঞান বিতরণ করবে। মেকলের এই মত পরিস্রুতি নীতি (Filtration Theory) বলে পরিচিত। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার হলে কালক্রমে তা' সমাজের তথাকথিত নিম্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দেশের জনসাধারণের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে। মেকলের মত গভর্ণমেণ্ট মেনে নিলেন। দেশে নব্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হল

এই নব্য শিক্ষাপ্রসারের ছুটি পথ গভর্ণমেণ্টের সামনে খোলা ছিল। হয় প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তার সাহায্যে নব্য শিক্ষা দেওয়া, আর না হয়, প্রাচীন ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি করা। আডম প্রভৃতি ব্যক্তিরা প্রাচীন ব্যবস্থার সাহায্য নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বল্লেন পাঠশালাগুলি সংস্কার এবং সেই সঙ্গে গুরুমশাইদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতা বাড়িয়ে দেশীয় ভাষায় নতুন ধরণের শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করলে কাজ ভাল হবে। তাতে একদিকে যেমন লোকে সহজে পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারবে তেমনই শিক্ষা-প্রসারের জন্যে ব্যয়ও হবে অনেক কম। মেকলের পরিস্রুতি নীতির ওপর এঁদের আস্থা ছিল না। এই মতবাদের ভুল কোথায় তা' দেখিয়ে এঁরা বল্লেন যে এভাবে শিক্ষা দিলে জনশিক্ষার প্রসার কোনদিনই হবে না। শিক্ষা জগতে "ইংরেজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত" এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হবে মাত্র। তাঁরা এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণও করে-ছিলেন। কিন্তু কিছু হল না। ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাচীন পদ্ধতির সাহায্য না নিয়েই এদেশের লোককে শিক্ষা দেবার মনস্থির করলেন। কথামত কাজও শুরু হল।

কিন্তু এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুরাগীদের বিবাদের

অবসান হয় নি। প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগীরা যখন দেখলেন তাঁদের পরামর্শে কোন কাজ হবে না তখন নিরস্ত হয়েছিলেন বটে কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন নি। তাই বেন্টিকের পর অকল্যাণ্ড যখন এদেশের বড়লাট হয়ে এলেন তখন আবার তাঁরা প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের জন্যে আবেদন জানালেন। অকল্যাণ্ড দেখলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থনকারীদের সন্তুষ্ট করতে হলে আরও অর্থের প্রয়োজন। বরাদ্দ এক লক্ষ টাকায় উভয়পক্ষকে খুশী করা সম্ভব নয়। প্রাচ্য বিদ্যার জন্যে একত্রিশ হাজার টাকা এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার খরচ বাবদ আরও এক লক্ষ টাকা দেবার জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন করলেন। আর প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থনকারীদের খুশী করবার জন্যে তাঁদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করার এবং ছাত্র ও অধ্যাপকদের বৃত্তি দেবার দাবী মঞ্জুর করলেন। ওদিকে আবার পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার যাঁরা চাইছিলেন তাঁদের ইংরেজীভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার প্রস্তাব সমর্থন করে সন্তুষ্ট করলেন। কিন্তু তিনি নিজে মেকলের পরিস্রুতি নীতি সমর্থন করিতেন। সেজন্যে জনশিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। আসলে প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগীদের দু'একটা দাবী মেনে নিলেও নতুন ছাঁচে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার করার তিনি ছিলেন পক্ষপাতী।

এতদিন পর্যন্ত নব্য শিক্ষার প্রসারের দুটি দল ছিল। একদল চাইছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এর প্রসার আর অন্য দল ছিলেন প্রাচ্যদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী। তখনও পর্যন্ত কথ্য ভাষায় শিক্ষা প্রসারের কথা কেউ চিন্তা করেন নি। সে সময় সকলেরই ধারণা ছিল শিক্ষা দিতে গেলে হয় ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা, না হয় ইংরেজী ভাষার সাহায্য নিতে হবে। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে প্রথম কথ্য ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্যে আন্দোলন শুরু হয়। ঐ সব

অঞ্চলের আন্দোলনকারীরা বল্লেন দেশের ভাষায় শিক্ষা দিলে লোকে সহজে নতুন ভাবধারা গ্রহণ করতে পারবে। অতএব এই ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হোক। এঁরা মেকলের নীতি সমর্থন করতেন না। জনশিক্ষার প্রসার যাতে হয় তার জন্যেই দেশের সাধারণ ভাষায় শিক্ষা দেবার কথা এঁরা চিন্তা করেছিলেন। মাদ্রাজে মন্‌রো লোক-শিক্ষার জন্যে পাঠশালাগুলির সংস্কার এবং প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্যে দুটি করে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করতেও রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু ১৮২৭ সালে মন্‌রো হঠাৎ মারা গেলেন। ফলে কোন কাজই হল না। তিনি নিজে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সেগুলি ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত কোনরকমে টিঁকে ছিল। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আর কোনই নজর দেওয়া হল না। তার বদলে নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বোম্বাইতেও অনুরূপ চেষ্টা হয়েছিল জনশিক্ষার জন্যে। কিন্তু সেখানেও সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

১৮৪৫ সালে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের লাট সাহেব টমসন্ যখন এবিষয় নিয়ে আন্দোলন করেন তখন কর্তৃপক্ষ আর বেশী আপত্তি করলেন না। ড্যালহাউসী ছিলেন তখন এদেশের বড়লাট। টমসন্‌ই প্রথম মেকলের মতবাদের মোহ কাটিয়ে জনশিক্ষার জন্যে ভারত সরকারকে সচেতন করে তুলেছিলেন। তিনিই প্রথম এদেশে শিক্ষা-করের প্রচলন করেন। স্থির হল, দেশের জমিদাররা প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে রাজস্বের অর্দ্ধেক দেবেন। তারপর কোর্ট অফ ডিরেক্টরের অনুমোদনে দেশের গভর্ণমেণ্টকেও অনুরূপ সাহায্য দানে রাজী করান হয়েছিল। টমসন্ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে আরও একটি বিষয় প্রস্তাব করেছিলেন। দেশীয় বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন করে সেগুলিকে উন্নত করার জন্যে একটি আলাদা শিক্ষাবিভাগের প্রয়োজন, একথা তিনিই প্রথম চিন্তা করেন।

(খ) বেসরকারী প্রচেষ্টা

সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা করছিল। তখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করছিলেন প্রধানতঃ চারটি দল—মিশনারীরা, কোম্পানির কর্মচারীরা (এঁরা সরকারী কর্মচারী হলেও ব্যক্তিগতভাবে এদেশের শিক্ষা প্রসারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন), শিক্ষিত ভারতীয়রা এবং প্রাচীন পাঠশালা, টোল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকগণ।

মিশনারীরা ১৮১৩ সাল থেকে এদেশে শিক্ষা বিস্তার করবার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এর আগে পর্যন্ত বহু বাধাবিপত্তির মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল। তা'সত্ত্বেও মিশনারীদের কাজের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা' সামান্য নয়। প্রথম প্রথম কর্তৃপক্ষ এঁদের এদেশে আগমন ও ধর্মপ্রচার কোনটাই সমর্থন করতেন না। অনেক কষ্টে তাঁরা ওপরওয়ালাদের বোঝালেন যে এদেশের লোককে উন্নত করতে হলে ধর্মপ্রচার এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাদান, দুটিরই সমান প্রয়োজন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বধর্মত্যাগীদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। যাতে এই সব লোকেরা গভর্ণমেণ্টের চাকরী লাভ করে ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্যে মিশনারীরা বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় (Vocational School) প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া এদের জন্যে আরও মিশন স্কুল তাঁরা স্থাপন করেছিলেন। কারণ সে সময় খ্রীষ্টান ছেলেমেয়েরা সরকারী স্কুল অথবা দেশীয় বিদ্যালয়, কোথাও স্থান পেত না। এখানে সংক্ষেপে ১৮১৩ সালের শিক্ষা আইনের আগে মিশনারীদের কাজের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে

প্রথমে পর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক মিশনারীরা এদেশে এসে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ধর্মপ্রচার এবং সেই সঙ্গে নিজেদের দেশের আদর্শে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু

পর্তুগীজদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এসব বিদ্যালয়গুলিও নষ্ট হয়ে যায়।

পর্তুগীজদের পর দিনেমারগণ যখন এদেশে আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে প্রটেস্টাণ্ট মিশনারীরাও এসেছিলেন। এই সকল মিশনারীরা ১৭০৬ সালে ভারতের পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজের আশেপাশে কাজ আরম্ভ করেন। এঁরাই ১৭১৩ সালে মাদ্রাজে তামিল ভাষায় বইপত্র ছাপানোর জন্যে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করেন। মিশনারীদেরই প্রচেষ্টায় ১৭১৬ সালে ত্রানকুয়েবারে একটি শিক্ষণ-শিক্ষা (Teachers' Training) প্রতিষ্ঠান এবং পর বছর মাদ্রাজে তামিল ছেলেমেয়েদের জন্যে চ্যারিটি স্কুল খোলা হয়েছিল। গরীব ছেলেদের জন্যে চাঁদা তুলে চ্যারিটি স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। এ সকল প্রচেষ্টার প্রবর্তক ছিলেন Ziegenbalg, কিন্তু তিন ১৭১৯ সালে মারা যান। তারপরও তাঁর সহকর্মীরা মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ কাজ করতে থাকেন। Kiernander এবং Schwarty নামে দুজন মিশনারী এসময় মাদ্রাজে বহু মিশন ও চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত করেন। লর্ড ক্লাইভ কলকাতায় একটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে Kiernanderকে আহ্বান করেছিলেন।

ওদিকে বাংলা দেশেও মিশনারীরা অনুরূপ কাজ করছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজের চেয়ে এখানে তাঁদের আরও অনেক বেশী বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৭৯৯ সালে উইলিয়াম কেরী যখন এদেশে ধর্ম-প্রচার করতে আসেন তখন তাঁকে প্রথমে কোম্পানির এলাকায় থাকতে দেওয়া হয় নি। কেরী দিনেমারদের আশ্রয়ে শ্রীরামপুরে গিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁর দুই বন্ধুও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এঁরাও কলকাতায় এবং শ্রীরামপুরে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

প্রথম প্রথম মিশনারীরাও কথ্য ভাষায় শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তখন সাধারণতঃ দেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর

লোকেদেরই তাঁরা ধর্মান্তরীকরণ ও শিক্ষাদান করছিলেন। এরা নিজের ভাষায় শিক্ষা দিলে সহজে বুঝতে পারবে, এই ছিল তাঁদের যুক্তি। কিন্তু শীঘ্রই তাঁদের মতের পরিবর্তন হল। শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মধ্যেও ধর্মপ্রচার করতে তখন তাঁরা আস্তে আস্তে আরম্ভ করেছেন। এই সব শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেশ খানিকটা তখন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই মিশনারীরাও নতুন নতুন ইংরেজী স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। তাঁরা ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি পাঠ্যের সঙ্গে বাইবেল পাঠও বাধ্যতামূলক করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কোম্পানির রাজ্য হারাবার ভয়ও অনেক কমে গেছে। তাই ১৮১৩ সাল থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত মিশনারীদের কাজে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করে নি। আর এই সময়ই মিশনারীরা সবচেয়ে বেশী কাজ করেন। তাঁরাই একরকম এদেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর স্কুল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। সরকারী কর্মচারীরা প্রথমে এসব সামাজিক ব্যাপারে নিরপেক্ষই ছিলেন। কিন্তু এদেশে সতীদাহ প্রথার মত কুরীতির যখন উচ্ছেদ করা হল এবং এর বিরুদ্ধে তুমুল কোন আন্দোলন হল না, বরং রামমোহন প্রমুখ অনেকেই এই উচ্ছেদে সাহায্যই করলেন তখন থেকেই সরকারও দেশের সামাজিক প্রথার সংস্কার করতে প্রয়াসী হলেন। তাই মিশনারীরা যখন স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে লাগলেন তখন সরকারও তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। এভাবে মিশনারীরা মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এদুটি প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র তাঁদের কাজের বিশেষ সুবিধে হয় নি।

১৮১৩ সালে মিশনারীদের চেষ্টাতেই পার্লামেণ্ট থেকে কোম্পানিকে নির্দেশ দিয়েছিল এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে বছরে এক লক্ষ টাকা

খরচ করতে। আসলে কিন্তু কোম্পানি পরিচালিত বিদ্যালয়ের খরচের জন্যেই এটাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, মিশন স্কুলের জন্যে নয়। মিশনারীরা প্রথমে একথা বোঝেন নি। কিন্তু এব্যবস্থার ফলে কোম্পানিচালিত স্কুল ও মিশনস্কুলের মধ্যে বিরোধ বাধল। সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল না, লোকে তাই এসব স্কুলেই ছেলেমেয়েদের পাঠাত। মিশনারীরা প্রমাদ গণলেন। তাঁরা দেখলেন এভাবে সরকারী স্কুল যদি মিশন স্কুলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে তাঁদের কোন কাজই সফল হবে না। সে জন্যে তাঁরা প্রস্তাব করলেন সরকারী বিদ্যালয়েও ধর্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হোক। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নি তবে মিশনারীস্কুলেও সাহায্য দান বন্ধ করেন নি।

মিশনারীরা ছাড়াও কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী ও বহু ইংরেজ ব্যবসায়ী এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ডেভিড হেয়ার, বেথুন সাহেব, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁরা যদিও ইংরেজী শিক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু মিশনারীদের ধর্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা তাঁরা মোটেই সমর্থন করতেন না। ডেভিড হেয়ার নিজের আদর্শে শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অর্থের অভাবে হিন্দু কলেজ সরকারের হাতে যায় এবং ১৮৫৪ সালে এই হিন্দু কলেজই প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়। বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টা ছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রসার করা। তাই তিনি মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখন সেই বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয় "বেথুনস্কুল" নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

ওদিকে এলফিনষ্টোন প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগীরা কি ভাবে

দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করে দেশের শিক্ষার প্রসার করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। বোম্বাইতে আগে থেকে যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্যে গভর্ণর এলফিনষ্টোন সেগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। যাতে গভর্ণমেণ্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত সাহায্য পায় সে ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। এঁরা বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র কোম্পানির অথবা মিশনারীর চেষ্টায় এদেশে শিক্ষার সুব্যবস্থা হবে না। কারণ মিশনারীর উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচারের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা আর কোম্পানির অভিপ্রায় ছিল রাজশক্তি হিসেবে কতকটা কর্তব্যের খাতিরে এ কাজে ব্রতী হওয়া। এদের কেউই দেশের শিক্ষাসংস্কৃতির কথা আলাদা করে ভাবতে পারে নি। তাই এঁরা যে সকল ভারতীয় এ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। প্রকৃত-পক্ষে এইসব উদারহৃদয় ইংরেজদের সহায়তা সে সময়ে না পেলে ভারতীয়দের কোন চেষ্টাই সফলতা অর্জন করতে পারত না। মিশনারী ও কোম্পানি কেউই এঁদের প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখতে পারে নি। শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহন রায় প্রথম দেশের শিক্ষা বিস্তারের কাজে নামেন। তিনি নিজে সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, গ্রীক ও ইংরেজী ভাষায় ছিলেন পণ্ডিত। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয়ে দেশবাসীকে শিক্ষিত করে দেশের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। প্রথমে অনেকে তাঁর বিরোধিতা করলেও পরে সকলেই প্রায় তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। রামমোহন রায়ই প্রথম ইংরেজী শিক্ষার মধ্যেও মাতৃভাষার চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি নিজে বাংলায় বহু ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি বই লিখেছিলেন এই উদ্দেশ্যে। স্ত্রীশিক্ষার জন্যেও তিনি আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় মেয়েদের লেখাপড়া শেখা সমাজে একটা অপরাধ বলে মনে করা হত। রাম-

মোহন রায় শাস্ত্র উদ্ধৃত করে তৎকালীন হিন্দুদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

এ ভাবে চারিদিকে যখন সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা চলছে এদেশে শিক্ষার সুব্যবস্থা করবার জন্যে তখন ১৮৫৩ সালে আবার কোম্পানির সনন্দ নতুন করে দেবার সময় এল। পার্লামেণ্টে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হওয়ার পর স্থির হল যে এযাবৎ যে সব কাজ করা হয়েছে শিক্ষাপ্রসারের জন্যে আগে ব্যাপকভাবে তার অনুসন্ধান করতে হবে। তারপর অনুসন্ধানের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে ভারত সরকার তাঁদের শিক্ষানীতির পুনর্গঠন করবেন। পর বছর ১৮৫৪ সালে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সার চার্লস উড্ এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে এক ডেসপ্যাচ্ ভারত সরকারের কাছে পাঠালেন। ভারত সরকার এই ডেসপ্যাচ্ অনুযায়ী তাঁদের শিক্ষানীতি ঠিক করলেন। এক কথায় বলা যায়, উডের ডেসপ্যাচ্ই এদেশে নব্য শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

ডেসপ্যাচে প্রথমে কি উদ্দেশ্যে কোম্পানি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করেছিল সে কথা বলা হল। উড্ সাহেব প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগীদের প্রচেষ্টারও প্রশংসা করলেন। এদেশের আইন কানুন প্রভৃতি জানার জন্যে যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা শেখা দরকার তা তিনি স্বীকার করলেন। কিন্তু শেষে মেকলে প্রভৃতির মতই দেখালেন যে এদেশের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সবই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ। তাছাড়া নতুন নতুন যে সব উন্নতি হচ্ছে চারদিকে তার নাম গন্ধ নেই প্রাচ্য সাহিত্যাদিতে। অতএব পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের কথা বলা হলেও উডের ডেসপ্যাচেই প্রথম ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে যে মাতৃভাষার চর্চা করা

প্রয়োজন সেকথাও বলা হয়। ডেসপ্যাচের মতে যারা ইংরেজী ভাষা শিখতে চায় অথবা এই ভাষার ওপর যাদের কিছু দখল হয়েছে তাদের এর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যারা ইংরেজী বোঝে না, হয়ত একটা দু'টো ইংরেজী শব্দ কোনরকমে শিখেছে তাদের মাতৃভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষক, অধ্যাপক প্রমুখ ব্যক্তিরা ইংরেজীর মাধ্যমে যে জ্ঞান আহরণ করবেন তাই মাতৃভাষার সাহায্যে দেশবাসীকে বিতরণ করবেন।

উডের ডেসপ্যাচেই এক একজন ডিরেক্টার অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ গঠন করার কথা প্রথম বলা হল। ডিরেক্টারের অধীনে আবার কয়েকজন পরিদর্শক থাকবেন। দেশে শিক্ষার কতটা উন্নতি হচ্ছে তাঁরা পরিদর্শন করে দেখবেন এবং এর সম্বন্ধে বাৎসরিক একটা রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টকে দিতে হবে।

দেশের উচ্চ ও মধ্য শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনেকদিন থেকে অনুভব করা হচ্ছিল। এর জন্যে ১৮৪৫ সালে একবার কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ওঠে। কিন্তু এ কথা সেসময় আর বেশী অগ্রসর হয়নি। অথচ অনেক ছেলেই ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা করতে আসত বিশেষ করে চাকরী পাবার জন্যে। পড়াশুনার ওপর নির্ভর করে চাকরী দিতে গেলে নিরপেক্ষভাবে তাদের যোগ্যতার তারতম্য নির্ধারণ একান্ত প্রয়োজন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে উড্ সাহেব কলকাতা, বোম্বাই এবং প্রয়োজন হলে মাদ্রাজেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করলেন তাঁর ডেসপ্যাচে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপরিচালক সভায় থাকবেন চ্যান্সেলার, ভাইস্‌চ্যান্সেলার এবং আরও কয়েকজন ফেলো বা সভ্য।

শুধু পরীক্ষা গ্রহণের কথা বল্লেও ডেসপ্যাচে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক নিয়োগের পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় নি।

ডেসপ্যাচে পরিস্রুতি নীতি বর্জন করে প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র পাঠশালাগুলিকে ক্রমানুসারে ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হল। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমোদিত কলেজগুলি, তারপর উচ্চ বিদ্যালয়গুলি, আর শেষ ধাপে থাকবে পাঠশালা প্রভৃতি প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ। যাতে পাঠশালার ভাল ভাল ছেলেরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় সেজন্যে বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করতে হবে।

লোকশিক্ষার প্রসারের জন্যে বেসরকারী শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ডেসপ্যাচে আর একটি নতুন নির্দেশ দেওয়া হল। ডেসপ্যাচের ফলে স্থানীয় শিক্ষাবিস্তার চেষ্টাকে সাহায্য (গ্রাণ্ট) দেবার রীতি প্রবর্তিত হল। যে সব বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং যে গুলির বিধিব্যবস্থাও বেশ উচ্চধরণের আর সেই সঙ্গে যে সব বিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের পরিদর্শনকার্য মেনে নেবে তাদের সাহায্য দেওয়া হবে। এভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্রমে বেসরকারী কর্মকর্তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গভর্ণমেণ্ট শুধু প্রয়োজনমত সাহায্য করে য়াবেন। ডেসপ্যাচে এই নীতি ঘোষণা করা হল।

এ ছাড়া, বৃত্তি শিক্ষা, শিক্ষকদের শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়েরও ডেসপ্যাচে উল্লেখ করা হয়। এক কথায় বলা যায় উডের ডেসপ্যাচে ভারতের শিক্ষা সমস্যাকে সমগ্রভাবে দেখা হয়েছিল।

ভারত গভর্ণমেণ্ট ডেসপ্যাচের নীতি মেনে নিয়ে সেইমত তাঁদের শিক্ষানীতি পুনর্গঠন করলেন। যদিও শিক্ষাবিভাগ গঠন এবং

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এই দুটি নির্দেশ ছাড়া বাকীগুলি কার্যে পরিণত করতে অনেক সময় লেগেছিল তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় পরবর্তী কালে এদেশে শিক্ষার যা কিছু উন্নতি হয়েছিল সবই এই ডেসপ্যাচকে ভিত্তি করে।

ডেসপ্যাচে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে সত্যি। কিন্তু তাই বলে একে শিক্ষাব্যবস্থার দলিল বা সনন্দ (Educational Charter) বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এর প্রধান ত্রুটি হচ্ছে ব্যাপকভাবে জনশিক্ষার কথা এতে বলা হয় নি। সাহায্যনীতির প্রবর্তন করে শিক্ষার প্রসারের কথা বলা হলেও দেশের সাধারণ লোককে শিক্ষিত করে তোলা যে গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য সে সম্বন্ধে তাতে স্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই। ফলে, উচ্চ শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হলেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজনমত বিস্তারলাভ করল না।

—চার—

ভারত সরকার কর্তৃক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ।

উডের ডেসপ্যাচ্ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার হবার আগেই দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৮ সালে (সিপাই বিদ্রোহের এক বছর পর) ভারত সরকার সরাসরি এদেশের শাসন ভার গ্রহণ করলেন এবং কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান হল। দেশের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয়ে কোম্পানির আর কিছু করবার রইল না। ভারত সরকার সব দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ কোম্পানির আমলে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচের সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান হল বলা যায়।

১৮৫৪ সাল থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা উডের নির্দেশ অনুযায়ী চলছিল। ১৯০২ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসিয়ে লর্ড কার্জন আবার এর কিছু অদলবদল করেন। ডেসপ্যাচের প্রধান দুটি নির্দেশ—ডিপার্টমেণ্ট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যথাক্রমে ১৮৫৫—৫৬ ও ১৮৫৭ সালের প্রথম দিকেই কার্যে পরিণত হয়েছিল।

১৮৫৪ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত আটচল্লিশ বছরের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নব্য শিক্ষার তৃতীয় অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই সময় দেশের অবস্থাও বেশ শান্ত হয়ে এসেছিল। কোম্পানির আমলের যুদ্ধবিগ্রহ, অরাজকতা প্রভৃতি এ সময়ে কিছু ছিল না। দেশের জন-সাধারণও প্রায় সন্তুষ্টচিত্তেই ব্রিটিশের শাসন মেনে নিয়েছিল। এর কারণ মুসলমানদের অত্যাচারে দেশ তখন এত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে কোন রকমে তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সকলেই তখন

ব্যস্ত। দেশে শাসনশৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। ইংরেজরা আসাতে এ অবস্থার পরিবর্তন হল। নতুন আইন কানুন প্রবর্তন করে আবার তারা দেশে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল। তাই জনসাধারণ যেন কতকটা কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ল ইংরেজদের কাছে। কোম্পানির আমলের প্রথমদিকেও এদের প্রতি সন্দেহ ও অসন্তোষ ছিল ভারতবাসীর মনে। কিন্তু এ অধ্যায়ে আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে অবশ্য ব্যতিক্রমও ঘটেছিল। দাদাভাই নওরজী প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরা তখন থেকেই ইংরেজের শাসনব্যবস্থাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। তারই ফলে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। তাহলেও লোকে তখন ব্রিটিশ শাসনের সংস্কার চেয়েছিল মাত্র, এর সম্পূর্ণ বিলোপ চায় নি। অনেকেই তখন ইংরেজদের অধীনে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করত। তাই ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাধারা দেশে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল।

কিন্তু এসময় দেশের আর্থিক অবস্থা ছিল খুব খারাপ। শাসন-ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির জন্যেই এসময়ে অর্থের টানাটানি হয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহ থেমে যাওয়ায় সামরিক ব্যবস্থার জন্যে ব্যয় তখন কমই হত। যদিও গ্রামদেশে ভূমিকর, সহরে গৃহাদির ওপর কর বসিয়ে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা হিসেবে কিংবা বিদ্যালয়ের বেতন হিসেবে টাকা তুলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করার চেষ্টা হলেও জনশিক্ষার জন্যে কোন অর্থসাহায্য তখন সরকারের তরফ থেকে করা হত না। অর্থের অভাব সত্ত্বেও এ সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছিল। কারণ উডের ডেসপ্যাচের ফলে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিতর্ক তখন অনেক কমে গিয়েছিল। উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশানুযায়ী শিক্ষানীতি

স্থির করে দেশে শিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছিল। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ ও লাহোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিদর্শন ও পরিচালনা করবার জন্যে প্রদেশে প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগও গঠন করা হল। সেই সঙ্গে বহু স্কুল কলেজের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আধুনিক ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও সৃষ্টি হতে লাগল। তাছাড়া, এসময়ে ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার ও হরিজন, আদিবাসী প্রভৃতিরও সুশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনও তখন থেকেই শুরু হয়।

১৮৫৪ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত উডের ডেসপ্যাচ্ ছাড়াও কয়েকবার শিক্ষাসম্বন্ধীয় অনুসন্ধান এবং সেই অনুযায়ী রিপোর্ট বেরিয়েছে। এর মধ্যে ১৮৮৩ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোম্পানির যুগে বিশবছর অন্তর যখন কোম্পানির সনন্দ নতুন করে দেওয়া হত তখন একবার করে এদেশের শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা হত। কিন্তু দেশের শাসনভার ভারত সরকারের হাতে যাওয়ার পর আর সে সুযোগ রইল না। পার্লামেণ্টে শিক্ষার বিষয়ে আর আলোচনা হয় নি। ভারত সরকারই সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। অথচ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে লাগল। আবার ওদিকে মিশনারীরা ১৮৫৪ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না, তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস করা হচ্ছে প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু করলেন। এ দুই কারণে বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আর এ উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে শিক্ষা কমিশন বসল।

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশগুলি থেকে মিশনারীরা মনে করেছিলেন সরকার আর শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবেন না।

মিশন স্কুলগুলিকে সাহায্য করা হবে দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে। তাহলে শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের আর কোন বাধা তাঁদের থাকবে না।

কিন্তু আসলে ঠিক উল্টো হল। ১৮৫৭ সালে এদেশে সিপাই বিদ্রোহের ফলে ভারতের ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার জন্যে ইংলণ্ডে আন্দোলন শুরু হল। আন্দোলনকারীরা মিশনারীদের ধর্ম-প্রচার কাজে যাতে আর না প্রশ্রয় দেওয়া হয় সে বিষয়েও চেষ্টা করতে লাগলেন। মিশনারীরা এরও বিরোধিতা করলেন। কিন্তু ফল কিছুই হল না। ১৮৫৮ সালে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এদেশের ধর্মব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার নীতি গ্রহণ করে সেইমত প্রতিশ্রুতি দিলেন দেশের জনসাধারণকে। তার ফলে ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত মিশনারীরা পদে পদে তাঁদের কাজে বাধা পেতে লাগলেন। তার ওপর আবার শিক্ষাবিভাগ কতকগুলি ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করল। জনসাধারণও দলে দলে এসব বিদ্যালয়ে যেতে লাগল পড়াশুনার জন্যে। তারা ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হলেও মিশনারীদের ধর্ম-প্রচারের রীতি বরাবর অপছন্দ করেছে। কিন্তু তখন উপায় ছিল না। তাই মিশন স্কুলে ভর্তি হত। এখন থেকে প্রায় সকলেই মিশন স্কুলের বদলে সরকারী স্কুলে ভর্তি হতে লাগল। এতে মিশনারীদের অসুবিধে হল আরও অনেক বেশী। সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মিশন স্কুল চালান সম্ভব নয়। এ নিয়ে ইংলণ্ডে ও ভারতে তাঁরা তুমুল আন্দোলন করতে লাগলেন। তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে ডেসপ্যাচের নির্দেশানুযায়ী সরকারী বিদ্যালয়ের বিলোপ অথবা হস্তান্তর কোনটাই করা হচ্ছে না। উপরন্তু সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে পাদ্রী হিসেবে তাঁদের যে এদেশে ধর্মপ্রচারের অধিকার আছে তাও খর্ব করা হচ্ছে। এর প্রতিকারের জন্যে তাঁরা তীব্র দাবী জানাতে লাগলেন। আর এরই ফলে ১৮৮২ সালে এক কমিশন বসল

সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করে সুমীমাংসা করবার উদ্দেশ্যে। কমিশনের সভ্যদের মধ্যে কয়েক জন ভারতীয়ও ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জষ্টিস্ তেলাং প্রভৃতির নাম করা যায়।

সব দেখে শুনে কমিশন তাঁদের রিপোর্টে যে সুপারিশ করলেন তা' মিশনারীদের মনের মত হল না। প্রথমেই কমিশন বল্লেন মিশনারীদের ওপর এদেশের শিক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। মিশনারীরা শিক্ষাপ্রসার কাজে একটা গৌণ স্থান অধিকার করবেন মাত্র।

মিশনারীদের বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার দাবী এদেশের তৎকালীন কয়েকটি নতুন ধর্মসম্প্রদায়—যেমন, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, প্রভৃতি সমর্থন করেছিলেন। তবে এঁরা বল্লেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ছেলেমেয়েদের হিন্দুধর্মের সারবস্তুরও শিক্ষা দেওয়া হবে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা তখন অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। খ্রীষ্টানধর্মের শিক্ষা বন্ধ হলেও ছাত্রদের নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রায় সকলেই একমত হলেন।

কমিশন কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা বলবৎ রাখাই স্থির করলেন। এমনকি নিজের নিজের ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার দাবীও সমর্থন করলেন না। সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার নীতি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তবে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাইভেট স্কুলে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে, তাতে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু এসব স্কুল সরকারী সাহায্য পাবে না। যে সব প্রাইভেট স্কুল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবে তাদেরই সাহায্য দেওয়া হবে। মিশনারীরা এতে খুশী হলেও ভারতীয়রা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা মনে করলেন কমিশন ধর্মব্যাপারে মিশনারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

করেছেন। ইংলণ্ডের নজির দেখিয়ে তাঁরা ভারতে Conscience Clauseএর ব্যবস্থা করার জন্যে কমিশনের নিকট আবেদন করলেন। যাতে অভিভাবকরা ইচ্ছে করলে বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা দেবার সময়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের না পাঠাতে পারেন। কমিশন সুপারিশ করলেন যেখানে মাত্র একটি বিদ্যালয় থাকবে সেখানেই কেবল ধর্মশিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও সাহায্য করা হবে। আর সেরকম স্কুলে যখন পাঠের অঙ্গ হিসেবে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে তখন ইচ্ছে করলে অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের না পাঠাতে পারেন। এভাবে ১৮১৩ সাল থেকে এদেশে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার কতকটা সমাধান হল।

এরপর মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার কাজও অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। তাঁরা কয়েকটি বিশেষস্থানে দেশের অনুন্নত আদিবাসী প্রভৃতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে আত্মনিয়োগ করলেন।

এদিকে অর্থের টানাটানির দরুণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও সরকারী বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই কমিশনও ডেসপ্যাচের মত সরকারী বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী কর্মকর্তাদের হাতে ছেড়ে দেবার সুপারিশ করলেন। মিশনারীদের ওপর শিক্ষার ভার দেওয়ার পক্ষপাতী কমিশন নন্। তাই স্থির হল ভারতীয়দের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপরই দেশের শিক্ষাভার ক্রমে ক্রমে ছেড়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বড়লাট রিপন আইন করে বিলেতের কাউন্টি কাউন্সিলগুলির মত এদেশেও ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করেছেন। কমিশন এই সব স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের ওপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেবার নির্দেশ দিলেন। আর মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার ভার ভারতীয় কর্মকর্তাদের ওপর দেবার ব্যবস্থা হল। কমিশনের প্রথম নির্দেশ

অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হল। গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে নবগঠিত বোর্ডগুলির ওপর চাপালেন। কমিশন যে উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা করেছিলেন তা'সফল হল না। তখনকার অবস্থায় প্রাচীন পাঠশালাগুলি সংস্কার করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করা একরকম অসম্ভব ছিল। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে তখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণই চলতে লাগল। কারণ লোকাল বডি বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টেরই এক একটি বিভাগ মাত্র। কমিশনের দ্বিতীয় নির্দেশানুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার দায়িত্বও বেসরকারী প্রচেষ্টাকারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল না। তার কারণ সরকারের ধারণা ভারতীয়দের হাতে পড়লে সরকারী বিদ্যালয়গুলি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ কাগজে কলমেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। আসলে ১৯০২ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃত্ব সমান বজায় রইল। কিন্তু অর্থের অভাবে সরকারী স্কুলের সংখ্যাও বেশী বাড়ে নি।

এ ভাবে ইচ্ছাকৃত না হলেও কতকটা অবস্থার চাপে শিক্ষা-ক্ষেত্র থেকে মিশনারী ও সরকার উভয়কেই সরে দাঁড়াতে হল। আর ভারতীয়দের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পূর্ণ সুযোগ পেল শিক্ষাবিস্তারের। ১৮৫৪ সালেও বেসরকারী প্রচেষ্টা বলতে বোঝাত মিশনারীদের প্রয়াস কিন্তু ১৮৮২ সালের প্রথমে ভারতীয়দের প্রয়াস সর্বোচ্চস্থান অধিকার করল। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। ভারতীয়রা দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই এ কাজে নেমেছিলেন। জন-সাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে যে দেশের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাবে না একথা সকলেই বুঝেছিলেন। নীচে ১৮৮১ ৮২

সালে দেশের স্কুলকলেজের সংখ্যার একটি তালিকা দেওয়া হল। তা থেকে ভারতীয়দের প্রচেষ্টা এসময়ে কতখানি সাফল্যলাভ করেছিল বোঝা যাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত	অ-ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত
১। আর্টস্ কলেজ	৫	১৮
২। মাধ্যমিক স্কুল	১,৩৪১	৭৫৭
৩। প্রাথমিক স্কুল	৫৪,৬৬২	১,৮৪২
৪। বৃত্তি শিক্ষার স্কুল ও কলেজ	১০	১৮
সমষ্টি	৫৬,০১৮	২,৬৩৫

প্রথম প্রথম অবশ্য উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীরা আধিপত্য করেছিল। ১৯০১-২ সালে এতেও ভারতীয়রা প্রাধান্য লাভ করল। এ সময়ে ভারতীয় কলেজের সংখ্যা হয়েছিল ৪২ আর মিশনারীদের ৩৭। আলিগড়ে মহামেডান-এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ এবং পুণায় ডেকান এডুকেশন সোসাইটির সৃষ্টি এ সময়েই হয়েছিল।

১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের পর থেকেই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দেবার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পক্ষপাতশূন্য হয়ে সাহায্য করা হত না। অনেক সময় মিশনস্কুলে অযথা সাহায্য করা হত বেশী। শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীরা প্রাইভেট স্কুলগুলিকে অনেক সময়ে উপেক্ষা করতেন। এসব স্কুলে সাহায্য দেবার অথবা বন্ধ করবার সময়ে স্কুলের পরিচালকদের সঙ্গে তাঁরা একটা পরামর্শও করতেন না। শিক্ষানীতি নির্ধারণের সময়েও শিক্ষাবিভাগের কর্মচারী ছাড়া আর

অন্য শিক্ষাবিদ্‌দের পরামর্শ নেওয়া হত না। সরকারী স্কুল-গুলিকে সহানুভূতি দেখানোর জন্যে সরকারী স্কুলের ছেলেদের বৃত্তি দেবারও ব্যবস্থা হল।

কমিশন দেখলেন যথার্থ শিক্ষার বিস্তার করতে হলে বেসরকারী প্রচেষ্টাকারীদের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। তাই সরকারী সাহায্য-দান নীতি পক্ষপাতশূন্য করার জন্যে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন।

১। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। বিভাগীয় পরীক্ষা-ব্যাপারে এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকেরাও সহযোগিতা করবেন।

২। পুরস্কার, বৃত্তি প্রভৃতি বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও দেওয়া হবে।

৩। সরকারী স্কুল কাছে থাকার অজুহাতে বেসরকারী স্কুলের সাহায্য বন্ধ করা চলবে না।

৪। সাহায্য-দান নীতির কিছু অদলবদল করতে হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে তা' করতে হবে। কি পরিমাণ সাহায্য করা হবে সে বিষয়ও স্পষ্ট জানাতে হবে। সাহায্যের জন্যে আবেদন করলে সরকারী তরফ থেকে উত্তর দিতে হবে। আর সাহায্য করা সম্ভব না হলে তার কারণ জানাতে হবে।

৫। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, অনুন্নত জেলায় যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মেয়েদের বিদ্যালয়ে এবং হরিজনদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিক সাহায্য করতে হবে।

৬। অযথা সময় নষ্ট না করে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। সাহায্য-দান নীতির কোন পরিবর্তন হলে সরকারী গেজেট

ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষাপ্রসার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন এমন প্রত্যেক লোককে জানাতে হবে।

৮। সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা যাতে বাড়ে তার জন্যে প্রাদেশিক শিক্ষাখাতে পর্যায়ক্রমে অর্থ বাড়াতে হবে।

৯। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করে সেই সব বিষয় পঠনের উৎসাহ জাগাতে হবে।

১০। বিদ্যালয়ের পরিচালকেরাই শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচন করবেন।

১১। যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের আগের চেয়ে ব্যাপকভাবে বিদ্যালয়ের পরিদর্শকরূপে নিয়োগ করতে হবে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট কমিশনের এই উদার নীতি গ্রহণ করলেন। মিশনারীদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হওয়ার ফলে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত প্রয়াসই এই সুপারিশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করল। ১৮৮২-১৯০২ সালের মধ্যে দেশে বহু স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার দ্রুত প্রসার হতে লাগল। কিন্তু প্রাথমিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার কোন উন্নতিই হল না। সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্যেই সহায়তা করে এসেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি তাঁরা বরাবরই একটা নিরপেক্ষ মনোভাব দেখিয়েছেন। তার কারণ ইংরেজ-রাজ এদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে বরাবরই দূরে সরে ছিলেন। ফলে, দেশের শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্বরূপে গণ্য হওয়ার বিশ বছরের মধ্যেও দেশের জনসাধারণের শিক্ষার কোনই সুব্যবস্থা হল না। এই প্রসঙ্গে আমরা ১৮৫৪ সাল থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্যে কি করা হয়েছিল এবং তার ফলে কতটুকু উন্নতি হয়েছিল আলোচনা করব। তারপর

মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তারের আলোচনা করলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কতটা নিরপেক্ষ ছিলেন সহজে বোঝা যাবে।

১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ্ থেকে শুরু করে ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন পর্যন্ত সব রিপোর্টেই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও এবিষয়ে আকর্ষণ করা হয়েছে। ডেসপ্যাচে দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার করে যাতে সহজে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় সেজন্যে অধিক অর্থ মঞ্জুর করার কথাও বলা হয়। কিন্তু এই ডেসপ্যাচেই স্থির হল প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরাসরি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করবেন না। স্থানীয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর এর ভার দিয়ে গভর্ণমেণ্ট শুধু প্রয়োজনমত সাহায্য করবেন। ১৮৫৯ সালে অবশ্য এনিয়ে কিছু বচসা হয় এবং তখন অনেকেই ইংলণ্ডের আদর্শে সরকারী বিদ্যালয়ের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। এসময় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার জন্যে শিক্ষাকর বসানোর কথাও বলা হয়। ১৮৫৪ সাল ও ১৮৫৯ সালের দু'টি পরস্পর বিরোধী সুপারিশের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হতে লাগল। কোথাও সরকারী বিদ্যালয়ের সাহায্যে কোথাও বা আবার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল। মাদ্রাজে জনশিক্ষার জন্যে বহুদিন পর্যান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছে। কেবল যেখানে একটিও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না সেখানে দু'একটি শিক্ষাকেন্দ্র সরকারী তরফ থেকে খোলা হয়েছিল। তাই ১৮৮১-৮২ সালে এখানে শিক্ষাবিভাগ দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় ছিল মাত্র ১,২৬৩ আর সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩,২২৮। এছাড়াও ২৮২৩টি দেশীয় পাঠশালা ছিল। বোম্বাই প্রদেশে একমাত্র

শিক্ষাবিভাগের দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত বলা যায়। আর বাংলায় এ উদ্দেশ্যে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা হয়েছিল দেশীয় পাঠশালার ওপর। বাংলা দেশের এ পাঠশালাগুলি সরকারী সাহায্য পেত খুবই কম। ১৮৫৯ সালের ডেসপ্যাচের বিধানমত ভারত সরকার শিক্ষাকর বসান স্থির করলেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির ওপরও কর বসল। বাংলাদেশ ছাড়া প্রায় সর্বত্র ১৮৬১-৭১ সালের মধ্যে স্থানীয় কর ধার্য করা হল। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা হওয়ার ফলে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত সকল প্রদেশে একরকম প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হল না। বাংলা দেশে পাঠশালার সাহায্য নেওয়ায় অল্প খরচে বহু লোককে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আবার বোম্বাই প্রদেশে প্রচুর সরকারী অর্থ সাহায্য পাওয়ায় সেখানেও প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু পাঞ্জাবে একে সরকারী সাহায্য ছিল অল্প তায় আবার ব্যয়সাধ্য সরকারী বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। ফলে, শিক্ষার প্রসার সামান্যই হয়েছিল। এ তিনটি প্রদেশের মতই অন্যান্য প্রদেশগুলির প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

১৮৮২ সালে শিক্ষা কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করে কয়েকটি নির্দেশ দেন। ডেসপ্যাচের মত কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে দেশের প্রাচীন পাঠশালাগুলির সংস্কারের কথাও বল্লেন। মাতৃভাষার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন সে কথাও বলা হল। তবে কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষার ভার স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর দেওয়াই সমীচীন মনে করলেন। কারণ তাঁদের মতে শিক্ষা বিভাগের ইউরোপীয় কর্মচারীদের চেয়ে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কর্মকর্তারা বেশী সহানুভূতির সঙ্গে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। আর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির

উন্নতির জন্যে পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে বেতন নির্ধারণ ও সাহায্য দানের বিধান কমিশন তাঁদের রিপোর্টে দিলেন। এতে অবশ্য আশানুরূপ ফল লাভ হয় নি। তবু কার্জনের শিক্ষানীতি প্রবর্তন হবার আগে পর্যন্ত ভারতের সব প্রদেশেই এই প্রথা মত কাজ হচ্ছিল।

বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন সম্বন্ধেও কমিশন কতকগুলি নির্দেশ দিলেন। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য নির্ধারণ করতে হবে। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করবেন বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী।

অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে একটি বিশেষ ফাণ্ড সৃষ্টি করার কথাও কমিশন বল্লেন। তবে এ ফাণ্ড স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরাই করবেন আর গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য হচ্ছে এতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করা। তার জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়মিত পরিদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন।

কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে সেইমত কাজ শুরু হল। কিন্তু প্রধানতঃ তিনটি কারণে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটল না।

প্রথমতঃ—সে সময় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন নি। কতিপয় ভারতীয় যদিও এ বিষয়ে বহুবার চেষ্টা করেছিলেন গভর্ণমেণ্ট কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। বরোদার মহারাজা তাঁর রাজ্যের একাংশে এই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে ভাল ফলই পেয়েছিলেন। ক্রমে তাঁর রাজ্যের সর্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডেও শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ফলেই জনশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। এ সব নজির দেখান সত্বেও ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলেন না।

দ্বিতীয়তঃ—প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে

আধাসরকারী কর্মকর্তাদের ওপর চাপান হল, কিন্তু দায়িত্ব পালন করবার মত উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া হল না।

তৃতীয়তঃ—দেশের পাঠশালাগুলির সংস্কার করে লোকশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলে কত সহজে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করা যেত। কিন্তু তা' হল না। ১৯০১—২ সালের মধ্যে এগুলি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর ব্যয়সাধ্য নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্যে। ফলে ১৮৫৪ সালের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে নানা রকম নতুন ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও এর সামান্যই প্রসার ঘটেছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ না হলেও তখন এর গুণগত উন্নতি মোটামুটি মন্দ হয় নি। আগের পাঠশালার নিজস্ব গৃহ বলতে কিছু ছিল না। কিন্তু এ সময় শিক্ষাবিভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থব্যয় করতে লাগলেন। আগের তুলনায় এখন প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে অধিক বিষয় পড়ান হতে লাগল। লেখা, পড়া ও হিসেব রাখা ছাড়াও ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পড়াবার ব্যবস্থা হল। শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়ানোর জন্যে তাঁদের শিক্ষণ-শিক্ষা (ট্রেনিং) দেওয়া হতে লাগল। তা'ছাড়া, কিণ্ডার-গার্টন্ প্রভৃতি আধুনিক প্রথায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও হয়েছিল। আর তখন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ছেলেরা এবং মেয়েরাও পড়াশুনা করতে লাগল।

উডের ডেসপ্যাচের ফলে ১৮৫৪—১৯০২ সালের মধ্যে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল। শিক্ষাবিভাগের প্রচেষ্টা এবং সরকারী সাহায্য নীতির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারেরা বেসরকারী প্রচেষ্টাতেও এর জন্যে মুক্ত হস্তে সাহায্য করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম মিশন স্কুলগুলিকেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বলে ধরা হত। কিন্তু ১৮৮২ সালের মধ্যে প্রাইভেট স্কুলের অধিকাংশই

ভারতীয়রা পরিচালনা করতে লাগলেন। ১৮৮২ সালে যখন শিক্ষা কমিশন বসল তখন গভর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক শিক্ষার ভার নিজ হাতে নেবেন কিনা তা'নিয়ে আলোচনা হল। কমিশন দেখলেন গভর্ণমেণ্ট স্কুলগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য অথচ বেসরকারী বিদ্যালয়ে অনেক কম খরচে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই তাঁরাও স্থির করলেন একমাত্র প্রয়োজন মত সাহায্য দান ছাড়া এ বিষয়ে আর কোন দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে যেখানে বেসরকারী বিদ্যালয় খোলার সুবিধে নেই সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সরকারকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য সরকারী বিদ্যালয়গুলিও ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের হাতে দিতে হবে। কমিশনের রিপোর্টের বিশ বছর পর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার কতটা হয়েছিল তার একটা হিসেব দেওয়া হল :—

	১৮৮১-৮২	১৯০১-০২
১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩,৯১৬	৫,১২৪
২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা	২,১৪,০৭৭	৫,৯০,১২৯

এই হিসেব দেখেই বোঝা যায় ঐ সময় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ভালই হয়েছিল। কিন্তু গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় তখন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নলিখিত প্রধান তিনটি বিষয়ের প্রতি কোন লক্ষ্য দেওয়া হয় নি।

(১) উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ সত্বেও এসময় মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার। তাই মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা দূরের কথা এর

অনুশীলনেরও কোন ব্যবস্থাই হয় নি বহুদিন পর্যন্ত। শিক্ষা কমিশনও এর কিছু বিহিত করলেন না। ফলে, ১৯০২ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চ স্তরে ইংরেজীর মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল, কেবল মধ্য স্তরে মাতৃভাষা ব্যবহার করা হত। ছেলেরা নিজের নিজের ভাষার অ, আ, ক, খ, ভুলে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে লাগল। বিষয়বস্তুর বদলে তখন ছেলেরা ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্যে বেশী চেষ্টা করত।

(২) উডের ডেসপ্যাচে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের প্রয়োজনীয়তার দিকেও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু ত্রিশ বছরের মধ্যেও এর কোন সুব্যবস্থা হল না। শিক্ষা কমিশনের আগে এদেশে মাত্র দু'টি প্রতিষ্ঠান ছিল, একটি মাদ্রাজে অপরটি লাহোরে, যেখানে শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াবার জন্যে ট্রেনিং দেওয়া হত। প্রয়োজনের তুলনায় খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষকই ট্রেনিং প্রাপ্ত হতেন। কমিশনের নির্দেশ সত্ত্বেও বিশ বছরের মধ্যে এবিষয়ে অল্পই উন্নতি হয়েছিল। ১৯০১-২ সালে মাত্র ছয়টি ট্রেনিং কলেজ এদেশে খোলা হয়। অবশ্য ট্রেনিং স্কুলের সংখ্যা কিছু বেশী ছিল।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা একান্ত পুঁথিগত হয়ে পড়েছিল। বৃত্তি শিক্ষার অর্থাৎ হাতে কলমে কাজ করতে শেখানোর কোন ব্যবস্থাই ছিল না বলা যায়। কিন্তু একটা জাতিকে শুধু বই পড়িয়ে উন্নত করা যায় না। তা'ছাড়া একদল শিক্ষার্থী আছে যারা পুঁথির সাহায্যের চেয়ে হাতে কলমে কাজ করতে শিখলে জীবনে বেশী উন্নতি করতে পারে। উডের ডেসপ্যাচের পর একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই ব্যবহারিক শিক্ষার জন্যে কিছু চেষ্টা হয়েছিল। তা'ছাড়া সর্বত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজ ছিল ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্যে তৈরী করা। এর প্রতিকার কল্পে কমিশন নির্দেশ দিলেন হাইস্কুলের উচ্চ স্তরে দু'টি

বিভাগ করা হ'বে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্র্যান্স বা প্রবেশিকা (১৯১০সাল থেকে একেই "ম্যাট্রিকুলেশন" বলা হত) পরীক্ষার জন্যে ছেলেদের তৈরী করবে, অপরটিতে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে দেশের যুবকরা ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও দক্ষতা লাভ করতে পারে। কমিশনের সুপারিশ মত প্রত্যেক প্রদেশে বিকল্প পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বিশেষ ভাল ফল পাওয়া গেল না। ১৯০১—২ সালে দেখা গেল এনট্র্যান্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেখানে প্রায় ২৩,০০০ ব্যবহারিক শিক্ষায় পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে তৈরী হয়েছিল মাত্র ২,০০০ ছাত্র। এবিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষতা ত ছিলই, দেশের লোকও তখন এর উপযোগিতা বোঝে নি। কারণ তখন লেখাপড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চাকরী লাভ। এনট্র্যান্স পাশ করলে চাকরী পাওয়ার তখন কোনই কষ্ট ছিল না। তা'ছাড়া লেখাপড়া শিখত তখন দেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা। তারা হাতে কলমে কাজ শেখার চেয়ে এনট্র্যান্স পাশ করে সরকারী কিংবা সওদাগরী আফিসে কেরাণীগিরিকেই বেশী সম্মানের চোখে দেখত। এর ফলে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক দূরবস্থারও কোন প্রতিকার হল না।

অবশ্য অন্য দিকে মাধ্যমিক শিক্ষার ফলে কিছু কিছু উন্নতি যে হয়েছিল তা' স্বীকার করতে হবে! যেমন এ সময় অনেক নতুন নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষার মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হওয়ায় ভাল ভাল ইংরেজী বইয়ের অনুবাদও করা হতে লাগল। সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। নব্য শিক্ষাধারায় শিক্ষিত ভারতীয়রাই এবিষয়ে অগ্রণী হলেন। এ শিক্ষার ফলে হিন্দুসমাজের অনেক কুরীতিও দূর হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদের কঠোরতা প্রভৃতি ক্রমশঃ উঠে যেতে লাগল।

দেশের রাজনৈতিক জীবনের ওপরও নব্য শিক্ষার প্রভাব কম নয়। এই ইংরেজী শিক্ষার ফলেই দেশের শিক্ষিত লোকের কাছে ব্রিটিশ শাসনের গলদ ধরা পড়েছিল। তাঁরাই শাসন সংস্কারের জন্যে আন্দোলন শুরু করলেন। যার ফলে ১৮৮৫ সালে হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি। নব্য শিক্ষার প্রথম আমলের তুলনায় এখন দেশের ধর্ম; দর্শন, প্রভৃতির প্রতি লোকের মনোভাবের পরিবর্তন হল। শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষিত লোকেরা এগুলির অনুশীলন করতে আরম্ভ করল।

এবার ১৮৫৪ সাল থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে দেশে উচ্চ শিক্ষার কিরকম বিস্তার হয়েছিল আলোচনা করে দেখা যাক।

দেশের মধ্য ও উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনেক দিন থেকেই অনুভব করা হচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে উডের ডেসপ্যাচে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হল বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ ও যোগ্যতানুসারে ডিগ্রী বিতরণ করবার জন্যে। এ ছাড়া পরিদর্শন করে উপযুক্ত বিবেচিত হলে কলেজগুলিকে অনুমোদন দানও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বলে ধরা হল। প্রথম দিকে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হলেও এর প্রায় সত্তর বছর আগে থেকে এদেশে কলেজী শিক্ষা অথবা উচ্চ শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার মাদ্রাসা, কাশীর সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতির নাম করা যায়। অবশ্য এগুলিতে প্রাক্তন প্রথা অনুযায়ী পড়ান হত। মিশনারীরাই প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার কলেজ স্থাপন করেন। এরপর গভর্ণমেণ্টও এরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। কিন্তু তখনকার কলেজের শিক্ষা ছিল অন্য ধরণের।

ইংরেজী স্কুলে যখন সেক্স্‌পিয়ার প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বই পড়ান হত তখন তাকেই কলেজ বলা হত।

প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৭ সালের পর থেকে আধুনিক উচ্চ শিক্ষার সূত্রপাত হয় এবং ১৮৮২ সালের মধ্যে দেশে উচ্চ শিক্ষার উন্নতিও যথেষ্ট হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ২১৯ জন ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু ১৮৮১—৮২ সালে শুধু ব্রিটিশ ভারত থেকেই ৭,৪২৯ জন ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিল এবং পাশ করেছিল ২,৭৭৮ জন। এ সময় বহু কলেজেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

প্রদেশ	১৮৫৭ সালে কলেজের সংখ্যা	১৮৮২ সালে কলেজের সংখ্যা
১। বাংলা	১৫	২৭
২। বোম্বাই	৩	৬
৩। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	৫	১১
৪। মাদ্রাজ	৪	২৫
৫। পাঞ্জাব	...	২
৬। মধ্য প্রদেশ	...	১
সমষ্টি	২৭	৭২

শিক্ষা কমিশন প্রত্যক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার বিষয়ে কিছু বলেন নি। কারণ কমিশন বসেছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন্যে। প্রাসঙ্গিকভাবে দু'-একটা মাত্র কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন তার ফলে উচ্চ শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

কমিশনের নির্দেশ মেনে নেওয়ার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার খুব বেড়ে গেল। বেশীর ভাগ ছেলেই মাট্রিক পাশ করে চাকরী পাবার জন্যে পড়াশুনা করতে লাগল। এর মধ্যে আবার উচ্চাভিলাসী বহু ছেলে ভাল চাকরী লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্যে কলেজে যেত পড়াশুনা করতে। কমিশনের সুপারিশের ফলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে ভারতীয়দের প্রচেষ্টাও যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিল। তখন ভারতীয়রা ৪২টি আর্টস্ কলেজ পরিচালনা করতেন আর মিশনারীদের অধীনে ছিল ৩৭টি। সর্বসমেত কলেজের ও ছাত্রের সংখ্যা ছিল নিম্নানুরূপ :—

	কলেজের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
(ক) আর্টস্ কলেজ—		
(১) পাশ্চাত্য ভাবধারার	১৪০	১৭,০৪৮
(২) প্রাচ্য ঐ	৫	৫০৩
(খ) বৃত্তি কলেজ—		
(১) আইন	৩০	২,৭৬৭
(২) চিকিৎসা	৪	১,৪৬৬
(৩) ইঞ্জিনিয়ারিং	৪	৮৬৫
(৪) শিক্ষণ শিক্ষা	৫	১৯০
(৫) কৃষি	৩	৭০
সমষ্টি	১৯১	২২,৯০৯

এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে তখন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা সামান্য ছিল। আর্টস্ কলেজে ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি পড়ান হত। আবার এদিকে বৃত্তি কলেজের মধ্যে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বেশী। কম ছেলেই তখন ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যেত। অর্থাৎ দেশে যান্ত্রিক শিক্ষার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে যে শিক্ষা দেওয়া হত তা' একান্ত পুঁথিগত। আধুনিক ভারতীয় ভাষা শেখাবার ব্যবস্থাও তখন উচ্চ শিক্ষা স্তরে ছিল না বল্লেই হয়। মাদ্রাজে এবিষয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল। বোম্বাই প্রদেশে ও বাংলায় কেবল মেডিক্যাল স্কুলে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে ইংরেজী ভাষাই প্রচলিত ছিল। ১৮৮০ সালের পর থেকে মেডিক্যাল স্কুলেও মাতৃভাষার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল।

এ আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় শিক্ষাব্যবস্থার ভার ভারত সরকারের হাতে যাওয়ার পর শিক্ষার উন্নতি মোটের ওপর ভালই হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট না হলেও দেশে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি দুইই হয়েছিল।

—পাঁচ—

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জন।

১৮৮২ সালের পর শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ মতই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছিল। উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হতে লাগল। এ সময়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশীয় ভাবাপন্ন করবার চেষ্টাও শুরু হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এক ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এ রকম আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল। সকলেরই উদ্দেশ্য প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে দেশের উপযোগী এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি করা।

এমন সময় কার্জন এদেশে এলেন বড়লাট হয়ে। তিনি এসেই অন্যান্য রাজনৈতিক আলোচনার সঙ্গে দেশের শিক্ষানীতিরও বিশদ আলোচনা করলেন এবং ১৮৫৪ সাল থেকে যে নীতি চলে আসছিল তার অনেক পরিবর্তন করে এক নতুন শিক্ষানীতির পরিকল্পনা করলেন। তাতে বলা হল শিক্ষাব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব এড়ালে চলবে না; বরং এ বিষয়ে আরও বেশী সরকারী প্রভাব বিস্তার করতে হবে। প্রাইভেট স্কুলের আদর্শরূপে আরও কতকগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে। তার জন্যে খরচও বেশী বরাদ্দ করা প্রয়োজন। তা'ছাড়া প্রাইভেট স্কুল-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথাও এতে বলা হল। এর আসল উদ্দেশ্য হল সে সময়ে দেশের শিক্ষিত লোকদের চেষ্টায় যে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই দমন করা। ইংরেজরা এদেশে নব্য শিক্ষার প্রচলন করেছিল বর্ণ ও নাম ছাড়া আচারে এবং ব্যবহারে একশ্রেণী ইংরেজ তৈরী করার জন্যে। যারা নির্বিবাদে নিজের দেশেই বিদেশী রাজের

দাসত্ব করবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। এ সব পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করতে লাগলেন। ইংরেজদের ধারণা হল শিক্ষাব্যবস্থাতেই নিশ্চয় গলদ আছে। অতএব এর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তন দুইই প্রয়োজন। কার্জন এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে শুরু করলেন। এই দমননীতির ফলে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী ও সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধল। প্রথম দিকে ভারতীয়দের প্রতিবাদে কোন ফলই হল না। শেষে অবশ্য এঁরাই জয় লাভ করেছিলেন ১৯২১ সালে। কিন্তু কার্জনের সময় এঁদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করা হয় নি।

কার্জন তাঁর শিক্ষানীতিতে প্রথমেই স্কুল কলেজের সংখ্যা কমিয়ে অথবা সংখ্যা আর বাড়াতে না দিয়ে যাতে শিক্ষার উন্নতি করা যায় সেদিকে নজর দেবার কথা বল্লেন। এর জন্যে অবাঞ্ছিত স্কুল কলেজগুলিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন। শিক্ষা কমিশন ব্যবস্থা করেছিলেন সাহায্য দেবার সর্ত হিসেবে শিক্ষাবিভাগ কতকগুলি আইন প্রণয়ন করবেন আর যে সব বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যপ্রার্থী হবে তাদের ওপরই এগুলি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যে সব স্কুল সরকারী সাহায্য নেবে না তাদের ওপর কোনরকম সরকারী নিয়ন্ত্রণ চলবে না। কার্জনের সময় থেকে এ নীতির পরিবর্তন হল এবং স্থির হল শিক্ষার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে সবরকম বিদ্যালয়ের ওপরই সরকারী কর্তৃত্ব চলবে। তাই ১৯০৪ সাল থেকে সাহায্যদানের পরিবর্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন দানের জন্যে কতকগুলি সর্ত ঠিক করা হল। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও যে সব স্কুলের ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও নিতে হবে বলা হল। এ ব্যবস্থাটা মন্দ হয় নি, কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকায় আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিদর্শক না থাকায় বিদ্যালয়গুলির সুপারিশের ওপর নির্ভর করে অনুমোদন দিতে হত। ফলে, অবাঞ্ছিত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অনুমোদন পেতে লাগল। এ নিয়ে শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংঘর্ষও বাধল। পরে অবশ্য এর বিহিত করবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের জন্যেও কয়েকটি সর্ত প্রণয়ন করা হয়েছিল।

আরও স্থির হল শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন লাভ করলে বিদ্যালয়-গুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে, এ সব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারী পরীক্ষায় এবং টেক্‌নিক্যাল স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে পারবে। যোগ্য ছাত্রদের সরকারী বৃত্তি দেওয়া হবে। আর যে সব বিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন নেই তাদেরও শিক্ষাবিভাগের অধীনে আনার জন্যে ঘোষণা করা হল অননুমোদিত স্কুলের ছেলেরা অনুমোদিত স্কুলে ভর্তি হতে এবং প্রবেশিকা কিংবা অন্য কোন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারবে না। এ ভাবে প্রায় সব বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হল।

কিন্তু কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমানোর নীতি মেনে নিলেও এ ভাবে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের নিয়ন্ত্রণ অনেকেই সমর্থন করলেন না।

মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারে বাধা ঘটালেও কার্জন এর মান উন্নতির জন্যে সত্যি চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সরকারী স্কুলগুলিকে প্রাইভেট স্কুলের আদর্শ বলে মনে করতেন, তাই এগুলির যোগ্যতা বাড়াবার জন্যে প্রাদেশিক সরকারদের অধিক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন। প্রাইভেট স্কুলের বরাদ্দ সাহায্যও বাড়ান হল। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার জন্যে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছিল। কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে মাতৃভাষার অবজ্ঞা সমর্থন করতেন না। তাই মধ্য শিক্ষার স্তরে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেবার সুপারিশ তিনি করলেন, তবে যাতে হাই স্কুলে গিয়ে অসুবিধে না হয় তার জন্যে

মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী পড়ানর কথাও বল্লেন আর একটি ব্যবস্থায় পরিদর্শকদের যোগ্যতা ও বেতন দুইই বৃদ্ধি করা হল মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিদর্শনের জন্যে। কার্জনের পরও এ ব্যবস্থা অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল।

কার্জন প্রাথমিক শিক্ষারও সংস্কার করতে শুরু করলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নীতি কিছু অন্য রকমের। উচ্চ শিক্ষার শুধু উন্নতি করতেই তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কাজ হল এর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি করা। তাঁর মতে সরকারী সাহায্যের অভাবে ১৮৮২ সালের পর প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কিছুই হয়নি বলা যায়। তিনি এরজন্যেও প্রাদেশিক সরকারদের অধিক অর্থ দেবার ব্যবস্থা করলেন। তার ফলে প্রাদেশিক সরকাররা লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে বেশী অর্থ দিতে লাগলেন। আগে এদের খরচের এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হত, এখন থেকে অর্দ্ধেক দেবার ব্যবস্থা হল। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানেও সাহায্য করা হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাইমারী স্কুল এবং এর ছাত্র সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। নীচে ১৮৮১ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হল।

	১৮৮১-৮২	১৯০১-০২	১৯১১-১২
১। অনুমোদিত প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা	৮২,৯১৬	৯৩,৬০৪	১,১৮,২৬২
২। ছাত্র সংখ্যা	২০,৬১ ৫৪১	৩০,৭৬,৬৭১	৪৮,০৬,৭৩৬

এখানে ১৯১১-১২ সালের তালিকা দেওয়া হল তার কারণ এসময়েই ঠিক ঠিক কার্জনের নীতি অনুযায়ী কাজ হয়েছিল। কমিশনের রিপোর্টের পর বিশবছরের মধ্যে প্রাইমারী স্কুলের যা ছাত্র সংখ্যা হয়েছিল তার দ্বিগুণ হল দশবছরে—১৯০১-০২ থেকে ১৯১১-১২ সালের মধ্যে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে খুশী হলেও কার্জন

নিশ্চিন্ত হলেন না। এর উন্নতির জন্যে প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। বাংলা দেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বরাবরই কম তাই এখানে আগে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হল। কার্জন শিক্ষকদের দু'বছর ধরে শিক্ষা দেবার নির্দেশ দিলেন। তিনিই প্রথম গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কৃষি-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার কথা চিন্তা করেন। কারণ গ্রামে সাধারণতঃ কৃষকদের ছেলেরাই পড়াশুনা করে। কৃষি কার্যের উন্নতি করতে হলে এদের কৃষি-বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তনও করা হল। শুধু লেখাপড়া ও হিসেব করতে শেখানো ছাড়াও যাতে এ সব স্কুলে দু'একটি প্রয়োজনীয় বিষয় পড়ান হয় সে ব্যবস্থা করা হল। কার্জন গ্রামের ও সহরের পাঠ্য বিষয় ভিন্ন করতে চেয়েছিলেন। গ্রাম ও সহরের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করার নির্দেশ তিনি দিলেন। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য শিক্ষক পাওয়া গেলে আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন্ প্রথার অনুসরণে বস্তু পাঠের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার কথাও কার্জন ভেবেছিলেন। কিন্তু সময়ের সংক্ষিপ্ততা ও অর্থের অভাবের জন্যে তাঁর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নি। শিক্ষানীতি ঘোষণা করার কিছুদিন পরই এদেশ থেকে তিনি চলে যান। তাই একান্ত ইচ্ছে সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কার্জন করতে পারেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন এবং ১৯০২ সালে ব্রিটিশ ভারতে তৎকালীন অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্যে এক কমিশনও নিয়োগ করেছিলেন। তখন দেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এগুলির শাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তা'ছাড়া স্কুল কলেজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক মোটেই

ঘনিষ্ঠ ছিল না। শুধু পাঠ্য বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে ও পরীক্ষা গ্রহণ করেই তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তব্য শেষ করত। স্কুলে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দেবার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না।

১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন হল। তাতে অন্যান্য কাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও করা হয়। এর জন্যে অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার নির্মাণ প্রভৃতির ব্যবস্থা হতে লাগল। ছাত্রদের বাসের সুব্যবস্থা করা এবং তাদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার জন্যেও কতকগুলি নিয়ম করা হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনের সুব্যবস্থার জন্যে নতুন আইনে ঠিক হল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা পরিচালকমণ্ডলীতে একশ' সদস্য বা ফেলো থাকবেন। তার মধ্যে আশি জনই গভর্ণমেণ্টর দ্বারা মনোনীত হবেন। এ ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষার ওপরও সরকার পুর্ণ কর্তৃত্ব করবার নীতি গ্রহণ করলেন। এ নিয়ে আন্দোলন খুব হল। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মত এখানেও কোনো ফল হয় নি।

অবশ্য সিণ্ডিকেটের বিধিব্যবস্থায় শিক্ষকদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কলেজগুলির অনুমোদন দিতে হবে গভর্ণমেণ্টের পরামর্শানুযায়ী। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক সীমা নির্দেশের ক্ষমতাও থাকবে বড়লাটের হাতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন সকলের কাম্য হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের নির্দেশ ভারতীয়দের খুশী করতে পারে নি। কারণ এতে তাঁদের কিছুই স্বাধীনতা রইল না। কিন্তু অসন্তোষের কারণ থাকলেও এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যথার্থ উন্নতি হয়েছিল তা' অস্বীকার করা যায় না। সেনেটের পুনর্গঠন হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেরও গোলমাল অনেক কমে গেল। আর এই আইনের জন্যেই ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করতে রাজী হলেন। পাঁচ

বছরের জন্যে বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য তাঁরা মঞ্জুর করলেন। এর মধ্যে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্যে আর বাকীটা কলেজের শিক্ষায় ব্যয় করতে হবে। এই সাহায্য পাওয়ায় উচ্চ শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হল।

কলেজের অনুমোদন দেওয়ার জন্যে অনেক বিধি-নিষেধ করা সত্ত্বেও এ সময় বহু নতুন কলেজের সৃষ্টি হয়েছিল।

দেশের উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার করেই কার্জন ক্ষান্ত হন নি। কৃষিবিদ্যা, শিল্পকলা, যান্ত্রিকশিক্ষা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতির শিক্ষাও যাতে প্রসার লাভ করে সে জন্যেও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কৃষিবিদ্যার চর্চা অবশ্য কার্জন এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু উন্নতি বিশেষ হয় নি। কার্জন বড় বড় প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করে কৃষিকলেজ খোলার নির্দেশ দিলেন। তা'ছাড়া বেতার যোগে কৃষিবিদ্যার শিক্ষা দেবার এবং মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে একে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বল্লেন। এবিষয়ে উচ্চ জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে পুনায় একটি রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদেশে যন্ত্রশিক্ষা লাভের জন্যে ভারতীয় ছাত্রদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা কার্জনের সময়ে হয়েছিল।

কার্জন স্কুল কলেজে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থাই সমর্থন করতেন। বই পড়িয়ে নীতিশিক্ষা দেবারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আদর্শ চরিত্র শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশলে এবং বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকলে ছেলেরা আপনা থেকেই চরিত্রবান হয়ে উঠবে। তার ওপর দু'একখানা মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়ালেই ছেলেদের নীতিজ্ঞান যথেষ্ট হবে। আলাদা পাঠ্য পুস্তক করে অথবা আলাদা ক্লাস করে নীতিশিক্ষা দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। কার্জনের এ যুক্তি সমর্থন না করে উপায় নেই।

উপসংহারে আমরা বলব তাঁর সব কাজের পেছনে একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকলেও এদেশের শিক্ষা সংস্কারের জন্তে তিনি আন্তরিক চেষ্টা ও সাহায্য করেছেন। শিক্ষার সকলদিকের প্রতিই তিনি নজর দিয়েছিলেন। আজ তাই আমরা তাঁর কূট রাজনীতি ভুলে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানটুকু মনে রাখব।

—ছয়—

স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্ট।

লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে ভারত ত্যাগ করেন। তাঁর শাসননীতির ফলে দেশময় যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তাই স্বদেশী আন্দোলনরূপে দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করল। মানুষ হিসেবে কার্জন বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ছিলেন সন্দেহ নেই এবং এদেশের শিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের উন্নতি তিনি আন্তরিকভাবেই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এদেশে তিনি এসেছিলেন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের নেতারূপে। এ অবস্থায় তাঁর আমলে ভারতীয়দের সকল সংস্কার প্রচেষ্টাকেই যে তিনি অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করবেন তাতে আর সন্দেহ কি? আর এই মনোভাবের জন্যেই বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও বড়লাট হিসেবে কার্জনই ভারতে সবচেয়ে বেশী অপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর সৎপ্রচেষ্টা-গুলিকেও, যেমন, পুরাকালের স্থাপত্য আর স্মৃতিস্তম্ভ ও স্তূপগুলির সংস্কার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি, জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখতেন। তার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু তাঁর ওপর নয়, সমগ্রভাবে ইংরেজ শাসনের ওপরই একান্ত বিরূপ হয়ে উঠলেন।

কার্জনের পরবর্তী বড়লাটরা তাঁর চেয়ে অনেক বেশী দূরদর্শী ছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন দেশের লোকের সহযোগিতা না পেলে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা ক্রমে অচল হয়ে পড়বে। তাই তাঁরা কার্জনের নীতি অনেকাংশে পরিবর্তন করলেন এবং যতটা সম্ভব সহানুভূতির সহিত ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগলেন। ১৯০৫ সালে মর্লি-মিণ্টো পরিকল্পিত শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং শাসনপরিষদে আগের চেয়ে অনেক বেশী ভারতীয়রা প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পেলেন।

কিন্তু দেশের শাসনব্যবস্থায় কার্জনের নীতির অদলবদল করা হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কোন নীতিই বাদ দেওয়া হল না। বরং আরও বেশী দৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলি কাজে পরিণত করার চেষ্টা চল্‌ল। তবে গভর্ণমেণ্টের তরফের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়ার ফলে কেবল প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করার জন্যে গোখ্‌লের বিল ছাড়া এ সময়ের শিক্ষা-সংস্কার কার্যে ভারতীয়রা তেমন বিরোধিতা করে নি। তাই ১৯২১ সালে শিক্ষাব্যবস্থার ভার এদেশের লোকের হাতে আসার আগে পর্যন্ত কার্জনী নীতি অনুসরণ করেই শিক্ষাসংস্কার হয়েছিল।

১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্যে অনেক কথা বলা হলেও কার্যতঃ বিশেষ ফললাভ হয় নি। তাই ১৯১৩ সালে আবার এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্তনের কথা উঠল। কিন্তু ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তখনকার মত কথাটা চাপা পড়ে গেল। তারপর ১৯১৭ সালে যুদ্ধের অবস্থা যখন কতকটা ভালর দিকে, তখন আবার শিক্ষা-সংস্কারের দিকে ভারত সরকার দৃষ্টি দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে এক কমিশন বসালেন। লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার মাইকেল স্যাড্‌লার এর সভাপতি হয়েছিলেন, তাই এই কমিশন স্যাড্‌লার কমিশন নামে পরিচিত। কমিশনের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে বাংলা দেশের তৎকালীন উচ্চ শিক্ষার পরিচালক স্যার আশুতোষ মুখার্জিও ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও দেশব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার কি ভাবে সংস্কার করা যায় কমিশন প্রকৃতপক্ষে তাই আলোচনা করলেন। এই উদ্দেশ্যে কমিশনের সভ্যেরা সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেশের

তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। শেষে অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। ১৯১৯ সালে স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্ট বার হল।

প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল শিক্ষাব্যবস্থারই আলোচনা এতে করা হয়েছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার করা সম্ভব নয়, তাই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধেও মন্তব্য করলেন। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা স্বীকার করলেন কিন্তু একথাও বল্লেন যে বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করে আগে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা বিশেষ দরকার। এর জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন এত অল্প যে তাতে কোন যোগ্য লোকই কাজ করতে পারবে না। তা'ছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষা দেবার পদ্ধতি ঠিকমত জানা নেই। এর ওপর ছাত্রদের দারিদ্র্য ত আছেই। এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে অধিক অর্থের প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে বছরে অন্ততঃ চল্লিশ লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত বলে কমিশন নির্দেশ দিলেন।

কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনাও সমর্থন করলেন না। কারণ এ শিক্ষাব্যবস্থার ভারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপালে এর নিজের কাজে বাধা ঘটবে। দেশে তখন বহু কলেজের সৃষ্টি হয়েছে। তা'ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্কুল ও কলেজের একসঙ্গে সুব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে নতুন বোর্ড গঠনের সুপারিশ কমিশন করলেন। স্থির হল বোর্ডের বেশীর ভাগ সভ্যই হবেন বেসরকারী আর যাতে

বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনসাধারণের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয় সে জন্যে এতে উভয় তরফের উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি রাখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর সরকারী কতৃত্ব সম্বন্ধে কমিশন বল্লেন যে, বোর্ড ও বিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করে যতটুকু কর্তৃত্ব করা যায় গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে ততটুকু ক্ষমতাই থাকবে। জনসাধারণের শিক্ষাদান প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়াও চলবে না। বোর্ডের আসল উদ্দেশ্য জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

কমিশন আর একটি নতুন ব্যবস্থা করলেন। তাঁদের মতে কলেজে প্রথম দু'বছরে যা পড়ান হয় তা মাধ্যমিক শিক্ষারই অংশবিশেষ। অতএব এই শিক্ষাকালটাও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। আসল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরু হবে এ দু'বছরের পড়া শেষ হলে। এ স্তরের নাম দেওয়া হল ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ হলেও স্কুলেই ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স পড়ান হবে না। এর জন্যে আলাদা দু'বছরের ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডই ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার পরিচালনা করবে আর বোর্ডের নাম হবে বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এ্যাণ্ড ইণ্টারমিডিয়েট এডুকেশন। স্যাড্‌লার কমিশনের সুপারিশ বাংলাদেশে গ্রহণ করল না।

শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থার উন্নতিও করা হতে লাগল। স্থির হল গ্রাজুয়েট কিংবা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে না। ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাআইনে বলা হল নব্য শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকতা করা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে কাউকে শিক্ষকপদে নিয়োগ করা হবে না। ফলে, দেশে ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা বাড়তে লাগল। আগে মাত্র চারটি ট্রেনিং কলেজ ছিল, সে জায়গায় এখন তেরটি ট্রেনিং কলেজ খোলা হল। শিক্ষকদের বেতনও কিছু

বাড়ান হল। এছাড়া, অন্যান্য কতকগুলি বিষয়েরও যথাসাধ্য উন্নতির চেষ্টা হতে লাগল। কেবল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার এবং বৃত্তি শিক্ষার সুব্যবস্থা, এ দুটি সমস্যারই কোন মীমাংসা হল না মাধ্যমিক স্তরে।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারও যথেষ্ট ঘটেছিল। তখন দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাত হাজার পাঁচশ' ত্রিশ (৭,৫৩০) আর ছাত্রের সংখ্যা ছিল এগার লক্ষ ছ'হাজার আটশ' তিন (১১,০৬,৮০৩)। সংক্ষেপে বলা যায় এ সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি দুইই হয়েছিল।

স্যাড্‌লার কমিশনের আসল কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করা। তাই এ বিষয়ে কিছু বিস্তৃতভাবেই তাঁরা আলোচনা করলেন। ১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মত তাঁরাও অবাঞ্ছিত কলেজগুলিকে উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দেবার প্রস্তাব করে কমিশন বল্লেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রী হবে বি, এ,। বি, এ, অনার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার জন্যেও কমিশন নির্দেশ দিলেন এবং বিলাতের নজির দেখিয়ে বি, এ, কোর্স দু' বছরের বদলে তিন বছর ধরে পড়াবার প্রস্তাব করলেন। কারণ এর কম সময়ে ঠিকমত পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশনের প্রস্তাব মত ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্যেও নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হল। আগে সেনেট সিণ্ডিকেটের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হত, এখন থেকে স্থির হল কোর্ট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, এক্সিক্যুটিভ কমিটি প্রভৃতি এর বিধিব্যবস্থা করবে। এযাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় অধ্যাপকদের কোন মতামত গ্রহণ করা হত না। কিন্তু কমিশন স্থির

করলেন এর পরিচালকসমিতিতে তাঁদেরও প্রতিনিধিত্ব করবার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। আর সিলেকসন্ কমিটির সহযোগিতায় অধ্যাপক ও রীডার নিয়োগ করা হবে।

ছেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে একজন ডিরেক্টর অফ ফিজিক্যাল ট্রেনিং নিয়োগের কথাও রিপোর্টে বলা হল। ইনি অধ্যাপকের মতই বেতন ও পদমর্যাদা পাবেন। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অবৈতনিকভাবে কাজ করতেন, কমিশন এ পদও বৈতনিক করে দিলেন।

এ ছাড়া শিক্ষণ-শিক্ষা, যন্ত্রশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধেও কমিশন তাঁদের রিপোর্টে কয়েকটি জরুরী প্রস্তাব করলেন।

স্ত্রীশিক্ষার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বোর্ড গঠনের কথা কমিশন বল্লেন। এই বোর্ড নারীদের উপযোগী বিষয়গুলি নির্ধারণ করে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিক্ষার জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি করতে বলা হল। আর ইণ্টারমিডিয়েট, বি, এ, ও এম, এ, কোর্সে "শিক্ষা" বা "এডুকেশন" বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করারও নির্দেশ দেওয়া হল। ফলিত বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার জন্যে আলাদা ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দানের ব্যবস্থাও করা হল।

স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টের ফলে দেশময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করা এবং নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জোর চেষ্টা শুরু হল। ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর ১৯১৬ সালের আগে পর্যন্ত আর কোন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এরপর ১৯২২ সালের মধ্যে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্যাড্‌লার কমিশনের আগেই ১৯১৬ সালে কাশীতে একটি নতুন ধরণের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপন করেন। এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর এম. এ, পর্যন্ত সকল রকম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। এটি অনেকাংশে আবাসিক এবং সম্পূর্ণ জনসাধারণের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৭ সালে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল। ১৯২০ সালে আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই সঙ্গে ঢাকা ও লক্ষ্ণৌতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করা হয়। এ ছাড়া ১৯১৮ সালে হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯১৬ সালে শুধু কলেজের অনুমোদন দেবার জন্যে মহীশূরেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। ১৯২১ সালে এলাহাবাদ ইউনিভারসিটিকে ঢাকা ইউনিভারসিটির আদর্শানুযায়ী পুনর্গঠন করা হয় এবং স্থির হল যে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং রাজপুতানার কলেজগুলি এর সহিত সংশ্লিষ্ট হবে।

কার্জনের সময় থেকে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য দেবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কার্জন যে টাকার বরাদ্দ করেছিলেন ১৯১১-১২ সালে তার ওপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্যে আবর্তমান সাহায্য হিসেবে দু'লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা এবং আবর্তমান নয়, এ রকম ষোল লাখ টাকা সাযায্য বরাদ্দ করা হল। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই চল্‌ল, তারপর বরাবরের জন্যে যে টাকা দেওয়া হত তার পরিমাণ বাড়িয়ে তেতাল্লিশ লাখ টাকা করা হল। এই অর্থ সাহায্যের ফলে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে যেমন গৃহ, গ্রন্থাগার প্রভৃতি তৈরী হতে লাগল তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-দানেরও সুব্যবস্থা হল। সবশুদ্ধ বারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটিতে শুধু শিক্ষা দেবারই ব্যবস্থা করা হল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন ও শিক্ষা দুইই দিত। বাকীগুলির প্রধান কাজ অনুমোদন দান হলেও কোন কোন বিষয়ের শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা ছিল। তখন তিন রকম উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া

হত। কোথাও বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতের আমন্ত্রণ করা হত লেকচার দেবার জন্যে। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে এ ব্যবস্থা চলত। কোথাও বা শিক্ষা দেবার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যক্ষপদের সৃষ্টি হল, আবার কোথাও অনার্স স্কুল কিংবা পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস খোলা হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৭ সালে স্যাড্‌লার কমিশন বসার আগেই স্যার আশুতোষ মুখার্জির প্রেরণায় পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশ খুলে এম, এ, ও এম, এস-সি, পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার কলেজের যেমন উন্নতি হতে লাগল তেমনই সংখ্যাও বাড়তে লাগল আশাতীত রূপে। উনবিংশ শতাব্দীতে ছেলেরা পড়াশুনা করত চাকরী পাবার আশায়। এখন কিন্তু অন্য কোন উপায় না থাকার জন্যেই সকলে পড়াশুনা করতে লাগল। চাকরী পাওয়াও আর তত সহজ ব্যাপার ছিল না। ব্যবহারিক শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা তখনও না হওয়ায় ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরই ছেলেরা আই, এ, বি, এ, পড়তে ঢুকতো কলেজে। এ জন্যেই সাধারণ কলেজ এবং তার ছাত্রসংখ্যাও হু হু করে বাড়তে লাগল।

স্যাড্‌লার কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার কথা কিছু বলা হয় নি। কিন্তু আমরা যে সময়ের (১৯০৫-১৯২১) শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সে সময় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার কতটা হয়েছিল সে বিষয়েও এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে সাহায্য বরাদ্দ করার ফলে এর প্রসার ভালই হচ্ছিল। কিন্তু উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার মত এখানে গভর্ণমেণ্ট প্রসার অপেক্ষা উন্নতিই করার অধিক প্রয়োজন মনে করলেন এবং সেইমত ব্যবস্থাও হতে লাগল। জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা এ ব্যবস্থা সমর্থন

না করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্যে চাইলেন একে বাধ্যতামূলক করতে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আবার বিরোধ বাধল। ইতিমধ্যে বরোদার মহারাজা নিজ রাজ্যে পরীক্ষামূলক-ভাবে এ ব্যবস্থা চালু করলেন এবং তাতে ফলও ভাল হল। ভারতীয়দের জোর বেড়ে গেল। তাঁরা ব্রিটিশ ভারতেও যাতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় সে জন্যে জি, কে, গোখ্‌লের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানালেন। গোখ্‌লে ইংলণ্ডের ১৮৭০, ১৮৭৬ ও ১৮৯২ সালের বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের নজির দেখিয়ে এদেশেও যাতে সেই ব্যবস্থা হয় সেজন্যে ১৯১১ সালে শাসন পরিষদে এক বিল পেশ করলেন। বিলের দাবী ছিল সামান্য। সেটি হল যেখানে প্রয়োজন বলে মনে হবে সেখানেই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিল নিয়ে সরকারী মহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হল। শাসন পরিষদের সরকারী এমন কি বেসরকারী সদস্যেরা গোখ্‌লের বিলের বিরোধিতা করলেন। ফলে, ৩৮-১৩ ভোটে তাঁর বিল পরাভূত হয়ে বাতিল হয়ে গেল। তখনকার মত যদিও ব্যাপারটা চাপা পড়ল কিন্তু লোকের মন থেকে ঘটনাটা মুছে গেল না। তাই ১৯১৮ সালে ভি, জে, প্যাটেল গোখ্‌লের অসম্পূর্ণ কাজ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বোম্বাই শাসন পরিষদে আবার ঐ দাবী করলেন। এবার আর প্রত্যাখ্যান না করে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় এর প্রবর্তন করা হল। শেষে এই প্রস্তাব বোম্বাই শিক্ষা আইনরূপে পাশ হয়ে প্যাটেল আইন নামে পরিচিত হল। প্যাটেলের উদাহরণ অন্যান্য প্রদেশেও অনুসরণ করা হল এবং ১৯২১ সালের আগে বহু বিল পাশ হয়ে গেল। এ সময় যে সব বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছিল তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

বছর	প্রদেশ	আইনের নাম	বালক অথবা বালিকাদের জন্মে বাধ্যতামূলক	গ্রাম অথবা সহরে প্রযোজ্য
১৯১৯	পাঞ্জাব	প্রাথমিক শিক্ষা আইন	বালক	উভয়
,,	যুক্তপ্রদেশ	,,	উভয়	পৌরসভা
,,	বাংলা	,,	বালক (১৯৩২ সালের পর বালিকাদেরও)	,,
,,	বিহার ও উড়িষ্যা	,,	বালক	উভয়
১৯২০	বোম্বাই	বোম্বাই সিটির প্রাঃ শিঃ আইন	উভয়	শুধু সিটিতে প্রযোজ্য
,,	মধ্যপ্রদেশ	প্রাঃ শিঃ আইন	,,	উভয়
,,	মাদ্রাজ	এলিমেণ্টারী শিঃ আইন	,,	,,

সব জায়গায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করার জন্মে এবং সরকারী তরফের প্রতিকূল মনোভাবের ফলে ১৯১১-১২ সালের পর ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের দিক দিয়ে উন্নতি বিশেষ হয় নি। এই শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উন্নতিও তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নি। কেবল এ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিও হল কোন কোন প্রদেশে। বোম্বাইতে শিক্ষকদের বেতন আট টাকা থেকে তেত্রিশ টাকায় উঠল। কিন্তু বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজে বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাইভেট হওয়ায় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি হয় নি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়েরও কলেবর বৃদ্ধি করা হল। ১৯০২ সালেই এর আয়তন অনেক বেড়েছিল। এখন আবার প্রকৃতি

পাঠ প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতিরও কিছু কিছু সুব্যবস্থা হয়েছিল। আসলে এ সময়ে কাগজে কলমে যতটা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির চেষ্টা হয়েছিল কাজে অতটা ঘটে ওঠে নি।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা। উনবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য এর সূত্রপাত হয়, কিন্তু তখন বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। কার্জনের শাসননীতির ফলেই দেশময় জাতীয়তাবোধের সূচনা হয়েছিল বলা যায়। বঙ্গভঙ্গের সময়ে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় আর সেই সঙ্গেই দেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা আরম্ভ হল। স্থির হল, প্রথমে শিক্ষাব্যবস্থার ভার নিজেদের হাতে নিতে হবে। তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ বন্ধ করে মাতৃভাষার অনুশীলনের দ্বারা জাতীয় ভাবধারায় ছেলেদের গড়ে তুলতে হবে। মহাত্মা গান্ধী প্রথম এ নিয়ে আন্দোলন করেন এবং তখনই তিনি ইংরেজীর প্রাধান্য কমাতে এবং হিন্দুস্থানী ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার কথা বলেছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশের আর্থিক উন্নতি কিছুই হয় নি। শিল্প-বাণিজ্যের দিকে কোন দৃষ্টিই গভর্ণমেণ্ট দেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য ভারতকে চিরকালের জন্যে কাঁচামালের যোগানদার করে রাখা। কিন্তু গান্ধীজী প্রমুখ ব্যক্তিরা স্বল্প ব্যয়ে বৃত্তি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষার এক পরিকল্পনাও প্রস্তুত করলেন। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলন যখন শুরু হল তখন স্কুল কলেজর অনেক ছাত্রই তাতে যোগ দিয়েছিল। সরকার কঠোরতার সঙ্গে ছেলেদের শাসন করতে লাগলেন। এর ফলে অনেক ছেলে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলে, আবার অনেককে বহিষ্কৃত করা হল। এসব ছেলেদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে স্যার

৬—

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হল। জনসাধারণ এতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে লাগল। নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে উঠল। কিন্তু এ উৎসাহ বেশী দিন টিঁকল না। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টাও বন্ধ হয়ে গেল। এরপর যখন গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন তখন আবার একবার এ চেষ্টা হয়েছিল। তখনও কতকগুলি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ঠিক আগের মতই গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব উৎসাহ নিবে গেল। ছেলেরা একে একে সরকারী স্কুল কলেজে ফিরে গেল। একমাত্র বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুট ছাড়া অন্য সব জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও উঠে গেল। এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ উন্নীত হয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলজি নামে পরিচিত ছিল। সম্প্রতি সেটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

এর মধ্যে আবার ভারতীয়রা দেশে যখন শাসন-সংস্কারের আন্দোলন চলছে সে সময় শিক্ষাব্যবস্থার ভারও নিজেদের হাতে চেয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের পরিকল্পিত শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হল। এতে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এই দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তার হাতে রইল সংরক্ষিত বিভাগের ভার ; তিনি কার্যনির্বাহক সমিতির সহযোগিতায় এ বিভাগ পরিচালন করবেন। আর হস্তান্তরিত বিভাগের দায়িত্ব তিনি বহন করবেন ভারতীয় মন্ত্রীদের সহায়তায়। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ঠিক এ ব্যবস্থাই প্রবর্তিত হল। শিক্ষার ভার ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে যাবার সূচনায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান সম্প্রদায় তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে এই ভয়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু করলেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থার

মত এক্ষেত্রেও তাঁদের আপত্তি টি'কল না। কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে ভারতীয়রা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করার অধিকার পেলেন। এখানেও দুটি বিভাগ, 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' করা হল। হিন্দু ইউনিভারসিটি প্রভৃতি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সরকারী কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্যে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলির ভার সরকারের হাতেই রইল। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, এর এলাকা নির্ধারণ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ও বাংলা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনব্যবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের বিচার্য বলে স্থির হল। এই অদ্ভুত ব্যবস্থার মধ্যে শুরু হল এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আর এক অধ্যায়।

—সাত—

দ্বৈতশাসনকালে এদেশের শিক্ষাসংস্কার।

দেশে দ্বৈতশাসন যখন শুরু হল তখন যুদ্ধের মেঘ কেটে গেছে। অভাব অনাটনও অনেক কমে গেছে। আর দেশময় একটা রাজনৈতিক জাগরণের সূচনা দেখা দিয়েছে। ইংরেজের শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রায় সকলেই হয়ে উঠেছে ব্যগ্র। ভারতের শাসন-ব্যাপারে ইংরেজের আধিপত্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। চারদিক থেকে আন্দোলন আরম্ভ হল ভারতীয়দের সহযোগিতায় দেশ শাসন করতে হবে। তারই ফলে হল মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের পরিকল্পিত শাসন-সংস্কার। এ অবস্থায় নানা অসুবিধে এবং বাধার মধ্যেও দেশী মন্ত্রীরা দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। তখন সকলেরই ধারণা হয়েছিল দেশকে উন্নত করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা। তাই নবনির্বাচিত মন্ত্রীরা প্রথমেই শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের আয়োজন করতে লাগলেন। শিক্ষা-সংস্কার করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন জনশিক্ষার প্রসার। সে জন্যে মন্ত্রীরা প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্যাপকভাবে লোকশিক্ষা দেবার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা বহুদিন থেকেই চলছিল। কিন্তু ওপরওয়ালাদের ঝোঁক শিক্ষার উন্নতি সাধন করা, শিক্ষার বিস্তারের খুব বেশী পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, এই ছিল এদেশের তৎকালীন কর্তৃপক্ষের মনোভাব। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পথে বহু বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার আসায় তাঁরা প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন তৈরী

করে একে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রাথমিক শিক্ষার বিল উপস্থিত করা হল এবং কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়ে গেল। এ ভাবে দেশী মন্ত্রীরা গোখ্‌লের বিলের পরাজয়ের প্রত্যুত্তর দিলেন। নীচে ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত যে সব প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছিল তার তালিকা দেওয়া হল :—

বছর	প্রদেশ	আইনের নাম	বালক অথবা বালিকার জন্যে	গ্রাম অথবা সহরে প্রযোজ্য
১৯১৯	পাঞ্জাব	প্রাথমিক শিক্ষা আইন	বালক	উভয়
,,	যুক্তপ্রদেশ	,,	উভয়	পৌরসভা
,,	বাংলা	,,	বালক (১৯৩২ সালে বালিকাদেরও)	,,
,,	বিহার ও উড়িষ্যা	,,	বালক	উভয়
১৯২০	বোম্বাই	বোম্বাই সিটি প্রাঃ শিঃ আঃ	উভয়	শুধু সিটিতে প্রযোজ্য
,,	মধ্যপ্রদেশ	প্রাঃ শিঃ আঃ	,,	উভয়
,,	মাদ্রাজ	এলিমেণ্টারী শিক্ষা আইন	,,	,,
১৯২৩	বোম্বাই	প্রাঃ শিঃ আইন	,,	বোম্বাই সিটি ছাড়া সর্বত্র
১৯২৬	আসাম	,,	,,	উভয়
,,	যুক্তপ্রদেশ	ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রাঃ শিঃ আইন	,,	গ্রাম অঞ্চলে

আইনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ভার পড়ল নতুন ধরণের বোর্ড বা কাউন্সিলের ওপর। এই বোর্ড বা কাউন্সিলরা নিজ নিজ এলাকায় প্রয়োজনমত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এঁরা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্যে শিক্ষাকর ধার্য করতে পারবেন। কোন কোন স্থানে আবার এইসব বোর্ডের ওপরই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ক্ষমতাও দেওয়া হল। প্রত্যেক প্রদেশের সরকারেরা এ উদ্দেশ্যে বোর্ড-গুলিকে অর্থ সাহায্য করবেন। সাধারণতঃ ছ'থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে স্থির হল। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রায় সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়ে গেল। প্রথমে সহর অঞ্চলেই এই আইন পাশ হয়। গ্রামে শিক্ষা আইন পাশ হতে আরও কয়েক বছর লেগেছিল। বাংলা দেশের গ্রামে ১৯৩০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়।

লোকশিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্যে সরকারকে দেয় খাজনার প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা শিক্ষাকর ধার্য করা হবে স্থির হল। এইভাবে যা আয় হবে তার ওপর সরকার আরও তেইশ লক্ষ টাকা সাহায্য করবেন।

এখন থেকে জেলাবোর্ডের বদলে স্কুল জেলা বোর্ড গঠন করে তার ওপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হল। শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের শিক্ষা, পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয়ের পরিদর্শনব্যবস্থা সবই করবে এই স্কুল জেলা বোর্ড।

এর ফলে ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সালের ভেতর প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ভালই হয়েছিল বলা যায়। ১৯২১-২২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সতের (১,৫০,০১৭) আর ছাত্রের সংখ্যা ছিল একষট্টি লক্ষ ন' হাজার সাতশ বাহান্ন (৬১,০৯,৭৫২)। সে জায়গায় ১৯২৬-২৭ সালে বিদ্যালয় হল এক লক্ষ চুরাশি হাজার

আটশ' উনত্রিশ (১,৮৪,৮২৯) আর ছাত্র আশি লক্ষ সতের হাজার ন'শ' তেইশ (৮০,১৭,৯২৩)। সেই অনুপাতে খরচও বাড়ল। ১৯২১-২২ সালে খরচ হত উনপঞ্চাশ কোটি চার লক্ষ উনসত্তর হাজার আশি (৪৯,০৪,৬৯,০৮০) টাকা আর ১৯২৬-২৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে খরচ হতে লাগল বছরে সাতষট্টি কোটি পাঁচ লক্ষ চোদ্দ হাজার আটশ' দুই (৬৭,০৫,১৪,৮০২) টাকা।

কিন্তু এ উৎসাহ বেশী দিন রইল না। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন পাশ হওয়ার প্রথমদিকের তুলনায় শেষের দিকে আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। প্রথমতঃ বিশ্বজোড়া আর্থিক অবনতির জন্যে দেশের গভর্ণমেণ্ট সবদিকেই ব্যয় সংকোচ করতে লাগলেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রেও বাদ গেল না। শিক্ষার জন্যে সরকারের তরফ থেকে যে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল তাও বন্ধ হল। এদিকে সর্বত্র শিক্ষাকর বসান এবং ঠিকমত কর আদায় কোনটাই না হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের নতুন নতুন বহু পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা গেল না। দ্বিতীয়তঃ ভারতে দ্বৈতশাসনকালে স্যার ফিলিপ হার্টগের নেতৃত্বে শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধানের জন্যে যে কমিটি নিয়োগ করা হয়, সেই কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা এর উন্নতি করার জন্যেই সুপারিশ করলেন। ফলে, আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে সর্বত্র এ আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা হার্টগ্ কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী এর উন্নতির চেষ্টা চলতে লাগল। কমিটি বল্লেন এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একটি গ্রাম্য সমস্যা বলা যায়। কারণ শতকরা প্রায় সাতাশি জন লোকই গ্রামে বাস করে। আর এদের মধ্যে অধিকাংশ হচ্ছে দরিদ্র চাষী। তারা চায় ছেলে রাখালি করে বছরে অন্ততঃ এক টাকা রোজগার করুক। তাতে সংসারের অভাব খানিকটা মিটবে। পাঠশালায় তিন চার বছর থেকে লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা

তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া আরও অন্যান্য অনেক অসুবিধে আছে যার ফলে ব্যাপকভাবে লোকশিক্ষা সম্ভব নয়।

কমিটি ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে প্রসার হয়েছিল তাও লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তবুও মন্তব্য করলেন এভাবে অর্থ ও উৎসাহের অপব্যয় না করে যাতে উন্নত ধরণের এবং স্থিতিশীল শিক্ষা এই স্তরে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করাই উচিত। এর জন্যে কমিটি কতকগুলি সুপারিশও করলেন। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষকের সমস্যা। এসব শিক্ষকেরা যদি নিজেরা ভালভাবে শিক্ষিত না হন তাহলে ছোট ছোট ছেলেদের গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। তাই কমিটি যাতে এঁদের উপযুক্তভাবে তৈরী করা যায় সেজন্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার নির্ধারিত সময় আরও বাড়াবার কথা বল্লেন। ট্রেনিং স্কুলে যারা শিক্ষকতা করবেন তাঁরাও যাতে যোগ্য ব্যক্তি হন সেদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। তাছাড়া শিক্ষকদের কাছ থেকে ভাল কাজ পেতে গেলে এঁদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

অন্ততঃ চার বছরের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর এর একঘেঁয়ে নীরস পাঠ্য বদলে উদার চিত্তাকর্ষক পাঠ্যের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গ্রামের ছেলেরা রাখালি ছেড়ে পড়াশুনার দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। এতুটি সমস্যার কথা ছাড়াও কমিটি প্রাথমিব শিক্ষার উন্নতির জন্যে আরও কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁদের মতে প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় সমস্যা, এর ওপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অতএব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গভর্ণমেণ্টের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করার জন্যেও অন্ততঃ কিছু নিয়ন্ত্রণক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের থাকা প্রয়োজন। এর জন্যে তাঁরা উপযুক্ত পরিদর্শক নিয়োগ করবেন

এবং এ দেরই সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবেন। সবশেষে কমিটি বল্লেন তাড়াতাড়ি করে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কোন প্রয়োজন নেই। তারচেয়ে এর ভিত্তি যাতে দৃঢ় হয় সে ব্যবস্থা আগে করা হোক।

সরকারী মহল হার্টগ্ কমিটির রিপোর্টে খুব খুশী হলেন। কারণ রিপোর্টে তাঁদের মনোমত কথাই বলা হয়েছে। দেশী লোকেরা এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁদের মতে যে দেশে শতকরা নব্বই জনেরও বেশী লোকের অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার বন্ধ করে এর উন্নতি করতে যাওয়া মস্ত ভুল। কিন্তু তাঁদের আপত্তি টিঁকল না। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বত্র বাধ্যতামূলক করা হল না। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার প্রয়োজন থাকলেও সেখানে অর্থের অভাববশতঃ তা হল না। সহরে যা হল তাও সর্বত্র নয়, দু'একটি পল্লীতে মাত্র। সরকারী কর্মচারীরা শিক্ষকদের যোগ্যতাবৃদ্ধি এবং লাইব্রেরী, রীডিংরুম প্রভৃতির ব্যবস্থা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার উন্নতি করতে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। ভারতের মোট পাঁচ লাখ (৫,০০,০০০) গ্রামের মধ্যে মাত্র তের হাজার বাহত্তরটি (১৩,০৭২) গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হল। তার মধ্যে দশ হাজার চারশ' পঞ্চাশটি (১০,৪৫০) গ্রামই পাঞ্জাব প্রদেশের। তখন মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশী লেখাপড়া শিখত। তাই মেয়েদের জন্যেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তা হল না। যেখানে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হল, সেখানে ছেলেদের জন্যেই হল, মেয়েদের জন্যে নয়।

ওদিকে সরকারী কর্মচারীদের চেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ শিক্ষার উন্নতিও হল না। ফলে, দ্বৈতশাসনকালে, বিশেষ করে ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি এবং প্রসার

কোনটাই হল না। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যার একটি তুলনামূলক হিসেব থেকে এ বিষয় স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। নীচে তারই একটি তালিকা দেওয়া হল :—

	১৯২১-২২	১৯২৬-২৭	১৯৩১-৩২	১৯৩৬-৩৭
১। অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়···	১,৫৫,০১৭	১,৮৪,৮২৯	১,৯৬,৭০৮	১,৯২,২৪৪
২। ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্র···	৬১,০৯,৭৫২	৮০,১৭,৯২৩	৯১,৬২,৪৫০	১,০২,২৪,২৮৮
৩। প্রাথমিক শিক্ষার মোট খরচ···	৪,৯৪,৬৯,০৮০ টাকা	৬,৭৫,১৪,৮০২ টাকা	৭,৮৭,৯৫,২৩৬ টাকা	৮,১৩,৩৮,০১৫ টাকা

এ সময় মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টাও হয়েছিল। রাজনৈতিক জাগরণের জন্যে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল বলা চলে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড-পরিকল্পিত শাসনসংস্কার গান্ধীজী সমর্থন করেন নি। এর বিরুদ্ধে ১৯২০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। ছাত্রছাত্রীরা সরকারী স্কুল কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিল। তখন আবার এদের শিক্ষার জন্যে নতুন নতুন জাতীয় স্কুল কলেজ সৃষ্টি হতে লাগল। বড় বড় গ্রামে, মফঃস্বল সহরে বহু বিদ্যালয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদেরও পড়ার উৎসাহ বাড়ল। আগে গ্রামের অথবা মফঃস্বলের ছেলেদের লেখাপড়া শিখতে হলে বাইরে যেতে হত। তাতে যে খরচ হত তা বহন করা অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হত না। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ফলে প্রায় সর্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ায় এ অসুবিধে অনেকাংশে দূর হল। বহু ছেলে, এমনকি তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেরাও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেল। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ষোল বছরের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তার ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলেই এ সময়ে মাধ্যমিক স্তরে অনেক ক্ষেত্রে নব্য ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করারও ব্যবস্থা হল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কাগজে কলমে যতটা আয়োজন হল কার্যতঃ পুরোপুরি-ভাবে সর্বত্র ইংরেজীর প্রাধান্য কমিয়ে মাতৃভাষার অধিকার স্বীকার করা হয় নি। তার প্রধান কারণ তখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী ভাল করে না শিখলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া গভর্ণমেণ্টের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলি সবই ইংরেজীর মাধ্যমে হত। এতে

ভাল ফল লাভ করতে গেলে ইংরেজী ভাষা শেখা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষাবিদ্‌রা অবশ্য তখন থেকেই যাতে বিশ্ববিদ্যালয়েও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় তার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের চেষ্টা কার্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে তখন বাধা ছিল বহু।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে বহু ট্রেনিং স্কুল ও কলেজের সৃষ্টি এ সময়ে হয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে পনেরটি প্রতিষ্ঠানে একশ' সাতচল্লিশটি মেয়ে সমেত এক হাজার চারশ' অষ্টআশি (১,৪৮৮) জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষকতার জন্যে ট্রেনিং দেওয়া হত। তাঁদের বেতন বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকদের চাকরী যাতে স্থিতিশীল হয় সে ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বৃত্তি শিক্ষা দেওয়ার কথা অনেকদিন থেকেই চিন্তা করা হচ্ছিল। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল পুথিগত শিক্ষাই দেওয়া হত। হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে ছেলেদের স্বাবলম্বী করার কোন ব্যবস্থাই ছিল না বলা যায়। মাদ্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি জায়গা ছাড়া ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা তেমন কোথাও হয়নি। মাদ্রাজের হাইস্কুলগুলিতে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং প্রভৃতি শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। যে সময়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে তখন ব্যবহারিক শিক্ষার প্রচলন আরও জরুরী হয়ে পড়েছিল। চারদিকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সব রকম ছেলেই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসত। তার মধ্যে এমন অনেক ছেলে ছিল যারা পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করার চেয়ে হাতে কলমে কিছু কাজ শিখতে পারলে জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারত। কিন্তু তখনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সে ব্যবস্থা ছিল না। সে সময়ে এর আশানুরূপ সমাধানও সম্ভব হয় নি। তার সঙ্গে মেয়েদের জন্যে আলাদা ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা ও গ্রাম্য পরিবেশের উপযোগী শিক্ষা গ্রামে দেবার ব্যবস্থা করাও বিশেষ প্রয়োজন

হয়ে উঠেছিল। এসব সমস্যার সমাধান করার জন্যে ভারত সরকারের অনুরোধে উড্ এবং এ্যাবট্‌কে ভারতে পাঠান হল। তাঁরা তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান করে কি ভাবে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে তাঁদের রিপোর্টে আলোচনা করলেন।

হার্টগ্ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার মত মাধ্যমিক শিক্ষারও প্রসার কমিয়ে সংস্কার করার জন্যে কতকগুলি নির্দেশ দিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা তখন ছিল ছেলেদের একমাত্র লক্ষ্য। এর প্রতিকারকল্পে শিল্প ও যন্ত্রশিক্ষা দেওয়ার কথা কমিটি বল্লেন।

এবার দেশী মন্ত্রীদের হাতে শিক্ষাব্যবস্থার ভার আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার কতটা হয়েছিল তাই আলোচনা করা হবে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্যে এ সময় এক ইণ্টার-ইউনিভারসিটি বোর্ড গঠন করা হল। এর প্রয়োজনীয়তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন। তারপরও দু'একবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রস্তাব ওঠে। অবশেষে সিমলায় এক বৈঠকের পর ১৯২৪ সালে বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থির হল সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা এতে থাকবেন। তা'ছাড়া বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময় শুধু কলেজের অনুমোদন দেওয়া ও পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়া উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার ও গবেষণার ব্যবস্থাও করা হল। বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন অধ্যাপক নিয়োগ করা হতে লাগল। ওদিকে গবেষণার কাজ যাতে ভাল করে হয় সেজন্যে উপযুক্ত গবেষণাগার এবং গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হতে লাগল। সেই সঙ্গে বৃত্তিদানের ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা হওয়ায় আগের তুলনায় অনেক সুষ্ঠুভাবে গবেষণার কাজ চলতে লাগল। একদিকে যেমন এভাবে

জ্ঞানের সীমা বাড়তে আরম্ভ হল অন্যদিকে বোর্ডের প্রচেষ্টায় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ের ও আন্তঃকলেজের খেলাধূলোর প্রচলন হওয়ায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মেলামেশাও অনেক সহজ হয়ে গেল।

সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যে ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোরের সৃষ্টি এ সময়েই হয়েছিল। এতে জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। অনেকে সামরিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার কথাও বল্লেন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান পড়ান হতে লাগল।

ছেলেদের স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের প্রতি এখন থেকে নজর দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করা হল এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শনের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হতে লাগল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার প্রসারও যথেষ্ট হয়েছিল এই ষোলবছরের মধ্যে। ১৯২১-২২ সালে দেশে কলেজ ছিল দু'শ' সাতটি (২০৭) তাতে মোট ছেষট্টি হাজার দু'শ' আটান্ন (৬৬, ২৫৮) জন ছেলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করত। ১৯৩৬-৩৭ সালে কলেজ ও ছাত্রের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হয়ে দাঁড়াল। এ সময় চারশ' ছেচল্লিশটি (৪৪৬) কলেজে সবশুদ্ধ এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দু'শ' আটাশ (১,২৬,২২৮) জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করত।

এ সময় শিক্ষার সকল স্তরে যা কিছু উন্নতি এবং অগ্রগতি হয়েছিল তার মূলে ছিল জাতীয় জাগরণ। স্বদেশী অন্দোলনের সময়ের মত ১৯২১ সালেও বহু জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সরকারী শাসনব্যবস্থার প্রতিবাদস্বরূপ। কিন্তু এবারও কিছুদিন পরই সব উৎসাহ

নিবে গেল। কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকীগুলি সরকারী স্কুল কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অবশ্য জামিয়া-মিলিয়া, বিশ্বভারতী, গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য না নিয়েই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এগুলিতে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির অনুশীলন হলেও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ উপকার হয় নি।

—আট—

কংগ্রেসী আমল ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা।

১৯৩৭ সালে দেশের শাসনব্যবস্থার আবার পরিবর্তন হল। দ্বৈতশাসনের বদলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল। ব্রিটিশ ভারতের এগারটি প্রদেশে নির্বাচিত মন্ত্রীরা স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাবার ক্ষমতা পেলেন। এর মধ্যে আবার সাতটি প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন কংগ্রেসী সদস্যেরা। কংগ্রেসের ওপর লোকের তখন প্রগাঢ় বিশ্বাস। তার কারণ ইংরেজের রাজত্বে দেশব্যাপী রাজনৈতিক জাগরণ থেকে শুরু করে দেশী মন্ত্রীদের পরামর্শে শাসনকার্য চালাবার ব্যবস্থা পর্যন্ত সবই কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে হয়েছিল, একথা বল্লে অত্যুক্তি হয় না। তাই লোকের মনে আশার সঞ্চার হল যে এবার সত্যি সব বিষয়ে সুব্যবস্থা হবে। শিক্ষাব্যবস্থারও যে পুনর্গঠন হবে সেবিষয়েও সন্দেহ রইল না। নির্বাচিত মন্ত্রীরাও উৎসাহের সঙ্গেই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের আবার মতবিরোধ হল যুদ্ধে ভারত সহযোগিতা করবে, না নিরপেক্ষ থাকবে, এই নিয়ে। ফলে, ১৯৪০ সালে মাত্র তিন বছরেরও কম সময় মন্ত্রীত্ব করে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। শিক্ষাসংস্কারের বহু পরিকল্পনাই শুধু কাগজে-কলমে রয়ে গেল, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সেগুলি কাজে পরিণত করতে পারলেন না। দেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চলেছিল মোট দশ বছর, ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত। এর মধ্যে দেশের নেতারা মাত্র পাঁচ বছর শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে, "ভারত ছাড়" আন্দোলন, হিন্দুমুসলমানের বিরোধ প্রভৃতি এতগুলি অপ্রিয় ঘটনা পর পর ঘটেছিল যে সে সময় নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার মত অর্থ ও অবসর কোনটাই ছিল না বলা যায়। সুতরাং লোকের আশা বাস্তবে পরিণত হল না।

কিন্তু শাসনব্যবস্থার মত দেশের শিক্ষাব্যবস্থারও ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের ফলে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। দ্বৈতশাসনের সময়ে শিক্ষার ভার কতকটা দেশী মন্ত্রীদের হাতে আর কতকটা ভারত সরকারের হাতে থাকায় নানা রকম অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছিল। এর প্রতিকারকল্পে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সময়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ও প্রাদেশিক দায়িত্বরূপে মাত্র দুটি ভাগ করা হল। স্থির হল কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি ও দেশের অন্যান্য প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্তম্ভগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনাধান স্থানগুলির শিক্ষাব্যবস্থা করা, দেশের প্রত্নতত্ব বিদ্যার সুব্যবস্থা করা এবং কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। এছাড়া শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব বহন করবেন প্রাদেশিক সরকারেরা। ১৯৪৬ সালেই কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের ভারও জাতীয়তাবাদী নেতাদের হাতে আসে। শেষে স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হলেন প্রথম কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল, এই দশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রসার ভালই হয়েছিল বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গান্ধীজীর "ভারত ছাড়" আন্দোলনের মত কয়েকটি রাজনৈতিক

ঘটনার ফলে দেশময় জাতীয় জাগরণ নতুনভাবে আবার দেখা দিল। এতদিন পর্যন্ত লোকে ব্রিটিশের অধীনেই দেশের শাসনপদ্ধতির সুব্যবস্থা যাতে হয় তার জন্যেই আন্দোলন করছিল। এবারের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হল ইংরেজের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করা। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করল। সরকারী আফিসে কেরাণীগিরি করে অর্থোপার্জনের মোহ কেটে যেতে লাগল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জীবনের মানোন্নতি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। তারই ফলে ছেলেরা স্কুলের পড়া শেষ করে দলে দলে কলেজে ভর্তি হতে লাগল। ওদিকে মেয়েরা এবং তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেরাও এই সময়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। চারদিকে বহু নতুন কলেজ খোলা হল। এমনকি জাতির জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাবার জন্যে এ সময়ে আরও চারটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা হল।

কয়েক বছরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার এরূপ প্রসার হওয়ায় তখন অনেকেরই ধারণা হয়েছিল বুঝি ভারতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাবার সুযোগ পেলেও দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এই প্রসার অতি সামান্যই বলা যায়। যে দেশের লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটিরও বেশী সে দেশে মাত্র আঠারটি বিশ্ববিদ্যালয় ক'টি লোকের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে পারে? সার্জেণ্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতে দু'হাজার দু'শ ছয় (২,২০৬) জন লোকের মধ্যে এক জন মাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। অবশ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকালে দেশে উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজন থাকা সত্বেও এ সময় ব্যবহারিক শিক্ষার উচ্চ জ্ঞানদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়

নি। ১৯০২ সাল থেকে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চল্লেও এযাবৎ কার্যতঃ কিছুই হয়নি।

দুটি কারণে এই দশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার প্রায় হয়নি বলা যায়। প্রথমতঃ প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা না হওয়ার জন্যে; দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যুদ্ধের ফলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই বেশী লেখাপড়া শেখে। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এই শ্রেণীর লোকেদের আর্থিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে অনেকের পক্ষেই ছেলেমেয়েদের কেবল জীবনধারণোপযোগী অন্নবস্ত্র যোগানো ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হত না। একদিকে যেমন নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলির দিন দিন হু হু করে দর বাড়তে লাগল অন্যদিকে তেমনি স্কুলের মাইনে থেকে শুরু করে বই, খাতাপত্র সবের মূল্য সাধারণ লোকের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেল। ফলে, অনেক ছেলেমেয়েকেই লেখাপড়া ছাড়তে হল। সঙ্গে সঙ্গে বহু স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৩৬-৩৭ সালের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় ১৯৪৬-৪৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হওয়া দূরের কথা বহুলাংশে অবনতি হয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুলের মোট সংখ্যা ছিল তের হাজার ছাপান্ন (১৩০৫৬) সে জায়গায় দশবছর পর স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াল এগার হাজার ন'শ সাত (১১,৯০৭)। আর্থিক অবনতির জন্যে এক হাজারেরও বেশী স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

শিক্ষার প্রসার এ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলেও মাধ্যমিক স্তরে কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু উন্নতি এবং পরিবর্তন করা এ সময়ে সম্ভব হয়েছিল। এই সময়েই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তখনও ইংরেজীর প্রাধান্যই ছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করতেন তাঁদের

ট্রেনিং দেবার সুব্যবস্থাও এ সময়ে কিছু হয়েছিল বল্লে ভুল হয় না।

১৯৪৬-৪৭ সালে দু'হাজার একশ' দশ (২,১১০) জন শিক্ষক এবং এক হাজার তিনশ' সাত (১,৩০৭) জন শিক্ষিকাকে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

যুদ্ধের বাজারে হাতে কলমে কাজ জানা লোকের প্রয়োজন হয়েছিল খুব বেশী। তাই এ সময় প্রাদেশিক সরকারেরা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি শেখাবার জন্যে স্কুল খুলতে লাগলেন। সেই সঙ্গে প্রাইভেট স্কুলেও সরকারের তরফ থেকে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হল ছেলেদের পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার জন্যে। এদিকে দিনের পর দিন বেকার সমস্যা বাড়ার দরুণ ছেলেরাও সহজেই ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। অনেক ছেলেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করে হাতে কলমে কাজ শিখতে লাগল অল্প সময়ের মধ্যে অর্থোপার্জনের জন্যে তৈরী হবার আশায়।

এ পর্যন্ত দ্বৈতশাসনের অবসান হবার পর ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-লাভের আগে অবধি ভারতের উচ্চ ও মধ্য শিক্ষাস্তরের অবস্থা আলোচনা করা হল। এবার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কংগ্রেস নেতারা কি করেছিলেন সে বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সরকারী তরফের প্রতিকূল মনোভাবের জন্যে দেশের নেতারা এমনকি দ্বৈতশাসনকালে দেশী মন্ত্রীরাও এবিষয়ে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাই শিক্ষাব্যবস্থার ভার হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথমে আবশ্যিক করার আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল

পর্যন্ত এক বছরে যে সব স্থানগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল।

প্রদেশ	বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স	শুধু ছেলেদের জন্যে আবশ্যিক যেখানে যেখানে হয়েছিল		শুধু মেয়েদের জন্যে আবশ্যিক যেখানে যেখানে হয়েছিল	
		নগর ও সহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	নগর ও সহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা
বিহার	৬-১০	১৭	...	...	...
বোম্বাই	৬-১১, ৭-৮	৯	১৩৪	১১০	৫,১০০
সিঃ পিঃ ও বেরার	৬-১১, ৭-১২	৩৪	১,০৩৯	...	...
পূঃ পাঞ্জাব	৬-১১	৩৭	১,৪২০	...	...
মাদ্রাজ	৬-১২, ৬-১৪	১৬	৩১	১২	১,৬০৭
উড়িষ্যা	৫-১০, ৬-১২, ৬-১৩,	১	১	...	...
ইউঃ পিঃ	৬-১১	৩৬	১,৩৭১	৩	৩
পঃ বাংলা	৬-১০	১	...	...	...
দিল্লী	৬-১২	১	৭	...	...

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে বোম্বাই প্রদেশেই আইনমত কাজ হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। এখানে প্রায় প্রতি গ্রামে এবং মিউ-নিসিপ্যাল এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে উন্নতি কিছুই হয় নি বলা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেই তাঁরা নিরস্ত হন নি। যেখানে যেখানে প্রাইমারী স্কুলের প্রয়োজন ছিল সে সব স্থানে এরূপ স্কুল খোলা হল। মেয়েদের জন্যে আলাদা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হতে লাগল এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের অধিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হল প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। বিদ্যালয়ে অধিক শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রীদের এত চেষ্টা ও আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও কার্যতঃ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কিছুই হয় নি। তার কারণ অর্থাভাবের জন্যে তখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছরের সঙ্গে তুলনা করলে নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে পরবর্তী দশ বছরে (১৯৩১-১৯৪১), উন্নতি যথেষ্ট হয়েছিল। ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে শতকরা মাত্র একজন লোকের নিরক্ষরতা দূর করা হয়েছিল, আর ১৯৩১-১৯৪১ সালের ভেতর ১২.২ লোককে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া হয়।

এ সময়ে হার্টগ কমিটির পরামর্শানুযায়ী ১৯৪৭ সালে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য এর জন্যে শিক্ষকদের যথেষ্ট আন্দোলন করতে হয়েছে। বোম্বাই প্রদেশে পঁয়তাল্লিশ হাজার শিক্ষক চুয়ান্ন দিন ধরে ধর্মঘট করেন বেতন বৃদ্ধির জন্যে।

দেশে ব্যাপকভাবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

দিতে হলে পুরনো পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তা' না করার জন্যে এতদিনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এ ভাবে প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তনও যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। এদিকে জাতিকে বাঁচাতে হলে তাকে নতুনভাবে গড়তে হবে। দেশের প্রত্যেক নরনারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কিন্তু কি করে সহজে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়, এই ছিল তখনকার সমস্যা। এরই সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী শিক্ষা-সংস্কারের এক নতুন পরিকল্পনা তৈরী করে ধারাবাহিকভাবে তাঁর হরিজন পত্রিকায় প্রকাশ করতে লাগলেন। এটি আজ বুনিয়াদী শিক্ষার ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পনায় দেখালেন যে যদি একটি উৎপাদনশীল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আর্থিক অনাটন সত্ত্বেও দেশে সার্বজনীন, অবৈতনিক এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করা সম্ভব হবে। কোন একটি শিল্পকে যেমন চরকা, তাঁত, কৃষি, বইবাঁধা, কাগজতৈরী অথবা দর্জির কাজকে উপলক্ষ্য করে ছেলেদের শিক্ষা দিলে একদিকে তারা ছোট থেকেই কিছু করতে পাওয়ার আনন্দে খুশী হয়ে কাজ শিখবে, অপরদিকে দরকার হলে তাদের দ্বারা তৈরী জিনিষ বিক্রী করে তাদেরই পড়াশুনার খরচ চালান যাবে। এমনকি প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের চালু খরচও এই থেকে নির্বাহ করা সম্ভব হতে পারে। অবশ্য কতকগুলি মিস্ত্রী বা কারিগর সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য নয়। তাই যন্ত্রের মত শিক্ষা না দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রত্যেক জিনিষটি কেন এবং কি ভাবে হচ্ছে তার যথাযথ ব্যাখ্যা করে ছেলেদের নির্ধারিত শিল্পটি শেখাতে হবে যাতে হাতেকলমে কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনেরও বিকাশ হয়। এ ভাবে শিক্ষা দিলে শিল্পটি শেখার সঙ্গে সঙ্গে এর সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটি

বিষয়ও শেখানো সহজ হবে। অবশ্য বেশী সময় দিতে হবে শিল্পটি শেখার জন্যে। যেমন চরকা কিংবা তাঁত শিল্পকে উপলক্ষ্য করে শিক্ষা দিলে স্বাভাবিক ভাবেই তুলোর প্রসঙ্গ এসে পড়বে। তুলো কি থেকে হয়, তুলো উৎপাদনের জন্যে কি রকম জলবায়ুর প্রয়োজন হয় প্রভৃতি বিষয়গুলি খুব সহজে চরকা কাটা কিংবা তাঁত চালানোর সঙ্গেই শেখানো যাবে। এ ভাবে যে সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি অনেক কিছু শেখানো যায় তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। তবে এমন কতকগুলো বিষয়ও আছে যেগুলি এ ভাবে পড়ানো সম্ভব নয়। সেগুলি সাধারণভাবে বইয়ের সাহায্যে পড়াতে হবে। তবে শিল্পটি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকে। সহরের ছেলেকে সহরের এবং গ্রামের ছেলেকে গ্রামের উপযোগী করে তুলতে হবে। তা হলে বাস্তব জীবনে অনেক সংঘর্ষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার বুনিয়াদী শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের কর্মপ্রেমিক করে তোলা। যতই আমরা বৃত্তিশিক্ষা অথবা ব্যবহারিক শিক্ষার জন্যে আন্দোলন করি না কেন প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীকে সমান মর্যাদা এখনও আমরা দিতে পারি নি। কিন্তু এ মনোভাব বেশী দিন থাকলে দেশের উন্নতি হতে পারে না। কারণ সমাজে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী উভয়েরই প্রয়োজন সমান, তাই উভয়বিধ পেশাকে সমান চোখে দেখতে হবে। দুটিরই যাতে উন্নতি হয় সে দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় থেকেই হাতের কাজকে ভালবাসাতে হবে। তারাই জাতির ভবিষ্যৎ; তারা যেন ভবিষ্যতে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক উভয়কে সমান শ্রদ্ধা করতে পারে। সেজন্যে বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক হলেও একে বৃত্তিমূলক

শিক্ষা বলা যায় না। অর্থোপার্জনের জন্মেই শিক্ষা দেওয়া এর উদ্দেশ্য নয়। মন এবং বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয়গুলির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কোন বিষয় আয়ত্ত করতে হলে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দু'য়েরই সাহায্য প্রয়োজন হয়। বই পড়ে যেটা জানা হল সেটা যদি আবার হাতেকলমে প্রয়োগ করা যায় তা হলে জ্ঞানটা অনেক বেশী পাকা হয়ে যায় এবং বুদ্ধিরও বিকাশ ভালভাবে হয়। সে জন্মেই প্রয়োজন বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প শেখানোর। আর এই মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনের জন্মেই বুনিয়াদী শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ধা পরিকল্পনায়। তাই পুরনো শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা জুড়ে দিলেই চলবে না। কারণ সেখানে রয়েছে পুঁথির প্রাধান্য। বই পড়িয়ে শিক্ষাদানের জন্মে এখানে বেশী সময় দেওয়া হয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। সে জন্মে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টারও বেশী সময় শিল্প সম্বন্ধীয় নানারকম কাজ শেখাতে হবে। তবে শিল্পটিকে এমনভাবে শেখানো উচিত যাতে প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থী সেটিকে বৃত্তি হিসেবেও অবলম্বন করতে পারে।

এর জন্মে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যবিষয়েরও পরিবর্তন করা হল। পুঁথির বোঝা কমিয়ে নানারকমের হাতের কাজ এবং কতকগুলি সাধারণ বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা এতে করা হয়েছে। ইংরেজীর স্থান এতে নেই। গান্ধীজীর মতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য থাকার জন্মেই এত দিনেও জনশিক্ষার প্রসার কিছুই হয় নি। কেবল তথাকথিত শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দুটি জাতির সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। অতএব এখন ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। সে জন্মে বুনিয়াদী শিক্ষায় আগাগোড়া মাতৃভাষার সাহায্যে

শিক্ষা দেবার নির্দেশ তিনি দিলেন এবং ইংরেজীর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা শেখাবার কথা বল্লেন।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এতে চার বছরের বদলে সাত বছরের জন্যে আবশ্যিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সাত থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। কারণ এর কমে কোন রকমে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া গেলেও শিক্ষার ভিত্তি ভাল হয় না। তাছাড়া এমন কতকগুলো বিষয় আছে যেগুলি খুব ছোট বয়সে এবং খুব অল্পসময়ে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এ ভাবে শিক্ষা সংস্কার করলে সাত বছরে ইংরেজী বাদে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর সমান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।

এই হল মোটামুটি ওয়ার্ধা পরিকল্পনা। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে সহযোগিতানীতির প্রবর্তন করা। হিংসা, দ্বেষ ভুলে যাতে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে সমাজে বাস করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গান্ধীজী শিক্ষাসংস্কারের খসড়া করেছিলেন। ছোট থেকেই ছেলেমেয়েদের এই সহযোগিতার নীতি শেখাতে হবে। পরস্পরকে ভালবাসতে এবং পরস্পরে মিলেমিশে যাতে কাজ করতে পারে সেজন্যে তাদের বিদ্যালয়ে একসঙ্গে কাজ করতে, একসঙ্গে খেলা করতে দিতে হবে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বইয়ের প্রাধান্য থাকায় ছেলেরা হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ শ্রমবিমুখ। তাদের পড়াশুনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সারাজীবন চাকরী করে কাটানো। শুধু বইয়ের বোঝা বাড়ার ফলে শিক্ষাব্যবস্থাও হয়ে উঠেছে নীরস এবং একঘেঁয়ে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় পুঁথি অপেক্ষা হাতের কাজকে প্রাধান্য দেওয়ায় বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির এ দোষের প্রতিকারের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে ছাত্রেরা একদিকে যেমন কাজকে ভালবেসে অধিকতর কাজের লোক হয়ে উঠবে, অন্যদিকে

তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশও যথেষ্ট হবে। সৃজনশক্তি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর এই সৃজনশক্তির প্রকাশই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তাই যাতে স্বাভাবিক এবং স্বাধীনভাবে এর প্রকাশ হয় তার জন্যেই প্রয়োজন ওয়ার্ধা পরিকল্পনানুযায়ী প্রতি বিদ্যালয়ে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা। নানারকম হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের সৃজনশক্তির বিকাশের এ একটি সুন্দর সুযোগ সন্দেহ নেই।

আবার বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে দেশের বিভিন্ন শিল্পগুলিরও পুনরায় অনুশীলন হবে। ফলে, দেশের নষ্ট শিল্প পুনরুদ্ধার করাও সহজ হয়ে উঠবে এবং সেইসঙ্গে শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার ও আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে।

এর আরেকটি সুবিধে হচ্ছে যারা উচ্চ শিক্ষালাভের যোগ্য নয় অথবা যাদের সে সুবিধে নেই তারা যে শিল্পটি বিদ্যালয়ে আয়ত্ত করবে সেটির দ্বারাই পরে জীবিকার্জন করতে পারবে। ফলে, দেশের বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অনেকেই একে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলে ধরে নিয়ে নানারকম বিরুদ্ধ আলোচনা করতে লাগলেন। তাই শিক্ষাবিদ্‌দের দিয়ে নতুন পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ওয়ার্ধায় ১৯৩৭ সালে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বৈঠক বসান হল। বৈঠকে জাতীয়তাবাদী নেতারা এবং কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীরা ছিলেন। তাঁরা সকলেই এর মূলনীতিগুলি পুরোপুরি সমর্থন করলেন। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতিও তাঁদের সঙ্গে একমত হলেন। তখন বৈঠকের সভ্যেরা ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে এক কমিটি নিয়োগ করলেন বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তারিত পাঠ্যসূচী নির্ধারণের জন্যে।

ডঃ জাকির হোসেন একজন শিক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তি। কমিটি পরিকল্পনাটির কিছু কিছু পরিবর্তন করে মূল জিনিষটি ঠিকই রাখলেন। তবে শিক্ষণ-শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিদর্শন, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের জন্যেও কমিটি নির্দেশ দিলেন। শিক্ষকেরা যাতে আর্থিক উন্নতির দিকটা বড় করে না দেখে ছেলেদের যথার্থ জ্ঞানদান করতে পারেন সেজন্যে তাঁদের বিশেষ ট্রেনিং দেবার নির্দেশ কমিটি দিলেন এবং ঠিকমত কাজ হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে উপযুক্ত পরিদর্শক নিয়োগের কথাও তাঁরা বল্লেন।

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট বার হবার পর থেকে পরবর্তী দু'বছর বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা চলতে লাগল; বিশেষ করে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিত্ব করছিলেন সেগুলিতে এবং কাশ্মীরে। বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হল, সেই সঙ্গে শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়াও হতে লাগল। কিন্তু দু'বছর পর যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন তখন উৎসাহ বহুলাংশে কমে গেল। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তকেরা অনেকেই এ সময়ে বন্দী হলেন। ফলে, অনেক জায়গায় কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কংগ্রেসের বদলে যাঁরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন তাঁরা ওয়ার্ধা পরিকল্পনাকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি। এখন ক্ষমতা হাতে আসায় এর সাফল্যের জন্যে সাহায্য করা দূরের কথা, বহু ক্ষেত্রে এঁরা বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন। কেবল বিহার গভর্ণমেণ্ট বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা চালাবার জন্যে রকম সাহায্য করেছিলেন। তাই চম্পারণ জেলার বেতিয়া সাব ডিভিসনের একটি স্থানে সাত বছর ধরে এর পরীক্ষা চালান সম্ভব হয়েছিল। তবে নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হলেও সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার কাজ বন্ধ হয়ে যায় নি। কোথাও না কোথাও চলছিল। প্রকৃতপক্ষে

জামিয়া-মিলিয়া, তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, সেবাগ্রাম হিন্দুস্থানী তালিম সংঘ প্রভৃতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানই এ সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চালিয়েছিলেন। তাই ১৯৪৬ সালে কংগ্রেস নেতারা পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নতুনভাবে পরীক্ষার কাজ শুরু হল। প্রত্যেক প্রদেশে এমনকি বহু দেশীয় রাজ্যেও বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করা হল আর যেখানে আগে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল সেখানে এর উন্নতি করা হতে লাগল। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যদি পুরো দশ বছর মন্ত্রিত্ব করতে পারতেন তা হলে যে বুনিয়াদী শিক্ষার আরও বেশী উন্নতি ও প্রসার হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা মাত্র চার বছর এ সুযোগ পেয়েছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার যে উন্নতি হয়েছে তাই যথেষ্ট বলে মনে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্যে প্রতি গ্রামে একটি করে বিদ্যামন্দির স্থাপনের কথা বলা হল। বিদ্যামন্দিরের কিছু জমি থাকবে, সেই জমির আয় থেকেই বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ চলবে। কিন্তু তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটি সমর্থন না করায় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা কাজে পরিণত হয় নি।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় সাত থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথাই বলা হয়েছিল। তার কম অথবা বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সম্বন্ধে কোন নির্দেশই এতে ছিল না। এ ত্রুটি সংশোধনের জন্যে ১৯৪৫ সালে গান্ধীজী 'নয়ী তালিম' নামে আর একটি শিক্ষা-সংক্রান্ত খসড়া করেন। এতে তিন থেকে ছ'বছরের শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। নয়ী তালিমে শিক্ষাব্যবস্থাকে চারিটি ভাগ করা হয়েছে।

(১) পূর্ব বুনিয়াদী, এই স্তরে তিন থেকে ছ'বছরের শিশুদের খেলার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। কারণ শিশুর কাছে খেলা ও

কাজ একই জিনিষ। তারপর শুরু হবে (২) কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা, কর্মকে উপলক্ষ্য করে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাদানই এ স্তরের বিশেষত্ব। (৩) তৃতীয় স্তর হচ্ছে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা, এখানে উচ্চ ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হবে। (৪) শেষ স্তরে বয়স্ক ব্যক্তিদের কি ভাবে সহজে লেখাপড়া শেখানো যায় সে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। নয়ী তালিমেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্যে আলাদা আলাদা পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে বয়স্ক ব্যক্তিদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা। বিদেশে বয়স্ক শিক্ষা বলতে বোঝায় প্রাপ্তবয়সের লোকেদের অধিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। কারণ সেখানে প্রায় সকলেরই অক্ষরজ্ঞান আছে। আর আমাদের দেশে বয়স্কশিক্ষার অর্থ হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক অগণিত নরনারীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। অতএব প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকরী করতে হলে বয়স্কশিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। কংগ্রেস আমলে ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে এবং বহু দেশীয় রাজ্যে খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের অক্ষরজ্ঞান দেবার কাজ চলতে লাগল। কিন্তু মন্ত্রীদের পদত্যাগের জন্যে ১৯৪০ সাল থেকে এ ক্ষেত্রেও সব উৎসাহ মন্দীভূত হয়ে যায়। তবে মন্ত্রীরা ফিরে আসার পর ১৯৪৬-৪৭ সালে আবার যখন এর কাজ শুরু হয় তখন এ প্রচেষ্টা কিছু সাফল্যলাভ করে।

—নয়—

যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনা।

সার্জেণ্ট রিপোর্ট

ইংরেজের আমলে ভারতের শিক্ষাসম্বন্ধীয় সবরকম বিতর্ক এবং আইন ইংলণ্ডের শিক্ষানীতির প্রতিধ্বনি বলা যায়। যখনই ওদেশে শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্যে কোন আইনের প্রবর্তন হয়েছে দেখা গেছে ভারতেও কিছুদিনের মাত্র ব্যবধানে অনুরূপ চেষ্টা শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের শেষের দিকেও এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইনের সৃষ্টি হয়েছিল যুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্যে। তারই অনুকরণে ভারত গভর্ণমেণ্টও যুদ্ধের পর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করার জন্যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি অথবা সেণ্ট্রাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড অফ এডুকেশন কর্তৃক এক শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করালেন। বোর্ডের সভ্য হচ্ছেন বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী এবং ডিরেক্টররা। গত কয়েক বছর ধরেই বোর্ডে শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনা চলছিল। কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীতও হয়েছিল। সেগুলিই একত্র করে এবং প্রয়োজনমত অদলবদল করে অথবা নতুন কোন প্রস্তাব যুক্ত করে ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ে পরামর্শদাতা স্যার জন সার্জেণ্ট এক শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করেন। তাই তাঁর নামানুসারে ভারতের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

এর আগে কখনও এরূপ ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায়

সকল শ্রেণী এবং সকল বয়সের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে যেমন তিন বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে তেমনি আবার মেধাবী ছেলে থেকে শুরু করে বিকলাঙ্গ এবং অল্পবুদ্ধি ছেলেদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনায় তিন থেকে পাঁচ ছ'বছরের শিশুদের জন্যে শিশু-বিদ্যালয় অথবা নার্শারী স্কুলের কথা বলা হয়েছে। শিশুদের শিক্ষার ভার থাকবে মেয়েদের ওপর। আর শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষা হবে অবৈতনিক তবে একে আবশ্যিক করা চলবে না। তারপর আরম্ভ হবে ছ' থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেদের জন্যে আট বছরের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা। এ স্তরেও অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হবে সকলকে। এই আট বছরের আবশ্যিক শিক্ষাকালকে আবার নিম্ন বুনিয়াদী এবং উচ্চ বুনিয়াদী এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হল। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে ছ'থেকে এগার বছর পর্যন্ত, পাঁচ বছর কাল লেখাপড়া করার পর ছেলেদের বুদ্ধি এবং শক্তি বিবেচনা করে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে অথবা উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে পাঠানো হবে। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। ইংরেজী পড়ান হবে না এবং ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মত একটি হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হবে। তবে একে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা চলবে না। আর ছাত্রদের তৈরী জিনিষ বিক্রী করে বিদ্যালয়ের খরচ চালানও হবে না। এখানেও যাতে বেশী শিক্ষিকা নিয়োগ করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে শিক্ষা পাবে। শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা হবেন ট্রেনিং প্রাপ্ত। এ স্তরের শিক্ষার শেষ হলে যোগ্য ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণতঃ এদের সংখ্যা শতকরা কুড়ি জনের বেশী হবে না।

বাকী ছেলেমেয়েরা যাবে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে। এখানে এগার থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তিন বছরের জন্যে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া হবে। উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হবে, সেইসঙ্গে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীও শিখতে হবে। আর প্রাদেশিক সরকারেরা সুবিধে মনে করলে ইংরেজী শেখানোর ব্যবস্থাও করতে পারেন। এই স্তরে একটি হস্তশিল্পকে বৃত্তি হিসেবে শেখানো চলতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তৈরী জিনিষ বিক্রী করে আয় করাও যাবে। এখানে মেয়েদের জন্যে আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। এমনকি তাদের পাঠক্রমও হবে ভিন্ন ধরণের।

আট বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ হলে বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা নিয়ে যোগ্যতানুসারে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এখানেই আবশ্যিক শিক্ষা শেষ হবে। এরপর কেউ যে হস্তশিল্পটির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাকে অবলম্বন করে জীবিকার্জনের চেষ্টা করবে, কেউ বা আবার যাবে নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয়ে। দু'তিন বছরে হাতের কাজে আর একটু পাকা হতে।

তারপর আরম্ভ হবে মাধ্যমিক শিক্ষা এগার থেকে সতের বছরের ছেলেমেয়েদের জন্যে। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা শেষ হলে যারা যোগ্য বিবেচিত হবে তারাই কেবল উচ্চ বিদ্যালয়ে ছ' বছর পড়বার সুযোগ পাবে। এখানে শিক্ষাদান অবৈতনিক নয় তবে গরীব ছেলেমেয়েদের বৃত্তি দেবার অথবা বিনা বেতনে পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। আর যে সব ছেলেমেয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার উপযুক্ত নয় তাদের অভিভাবকরা যদি লেখাপড়ার সম্পূর্ণ খরচ যোগাতে পারেন এবং মেধাবী ছেলেমেয়ে ভর্তি হবার পরেও যদি বিদ্যালয়ে স্থান থাকে তা হলে তারাও উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে। মেয়েদের জন্যে আলাদা

বিদ্যালয় করতে হবে। উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য, তবে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাই থাকবে।

মাধ্যমিক স্তরেও দু'রকমের বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে। একরকম বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হবে। তাকে বলা হবে জ্ঞানমুখী বিদ্যালয়। আর একরকম বিদ্যালয়ে যন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। একে বলা হবে শিল্পমুখী বিদ্যালয়। জ্ঞানমুখী বিদ্যালয়ে ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্যে এবং শিল্পমুখীতে ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পকাজের উপযোগী করে তাদের গড়ে তুলবে। শিল্পমুখী বিদ্যালয়ের ছেলেরা পরে উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে যান্ত্রিক শিক্ষার উচ্চ জ্ঞান লাভ করতে পারে। বেশীর ভাগ ছেলেই মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়া শেষ করবে। তবে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে যাবে তাদের সেখানে সতের থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত তিন বছরের শিক্ষা দেওয়া হবে। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রীর জন্যে তিন বছর পড়াশুনা করতে হবে। এখানেও যোগ্যতা অনুসারে ছাত্র নির্বাচন করা হবে আর মেধাবী গরীব ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা যন্ত্রশিক্ষার প্রসারের ওপর খুব জোর দিয়েছে, কারণ যুদ্ধের সময় যান্ত্রিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব বেশী করে বোঝা গিয়েছিল। পরিকল্পনায় শিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাকেও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি হচ্ছে নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয় আর অপরটি শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। প্রথমটিতে দু'বছর শিক্ষা দেওয়া হবে। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে ছেলেরা এখানে যোগ দিতে পারবে।

শিল্পমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে ছ'বছর ধরে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হবে। যারা

উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে কেবল তারাই এখানে শিক্ষালাভ করবে। এর পরের স্তর হচ্ছে উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয়। এখানে যারা কাজ শিখবে তাদের শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে আসতে হবে এবং তিন বছর শিক্ষালাভ করতে হবে। যান্ত্রিক শিক্ষার উচ্চতর জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষার কলেজ খোলার কথাও বলা হয়েছে। কলেজের শিক্ষাকাল হবে দু'বছর।

অন্ধ, বোবা, কালা প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের এবং যারা ক্ষীণমেধা অথবা জড়বুদ্ধি তাদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা করার জন্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সার্জেন্ট রিপোর্টে। সাধারণ এবং সুস্থ ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা দিলে এই শ্রেণীর শিশুদের বিশেষ উন্নতি ত হয় না উপরন্তু সাধারণ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই প্রয়োজন আলাদা ব্যবস্থার। বিশেষ বিশেষ সরঞ্জামের সাহায্যে যতটা সম্ভব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এদের শিক্ষা দিলে তবেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

এতদিন দেশে অবৈতনিক এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন না হওয়ায় শতকরা প্রায় আশি নব্বই জন লোকই এদেশের নিরক্ষর বলা যায়। একটি জাতির পক্ষে এ অবস্থা অভিশাপস্বরূপ। এতগুলি লোক নিরক্ষর থাকলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। তাই পরিকল্পনায় অল্পসময়ের মধ্যে যাতে তাদের অক্ষরজ্ঞান দেওয়া যায় এবং সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা দূর করা যায় সে জন্যেও কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণতঃ দশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের অক্ষরজ্ঞানহীন লোকেদের জন্যেই বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দশ থেকে ষোল বছরের ছেলেদের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিণত বয়সের লোকেদের সঙ্গে তাদের শিক্ষা দিলে চলবে না। তাছাড়া মেয়েদেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের বই পড়ে শেখার

মত ধৈর্য্য থাকে না, আবার অন্যে পড়লেও সেই শুনে বেশীক্ষণ মনে রাখাও সম্ভব নয়। তাই যতটা সম্ভব সিনেমা, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ প্রভৃতির সাহায্যে ছবি দেখিয়ে অথবা গ্রামোফন ও রেডিওর সাহায্যে কিংবা কথকতা, যাত্রা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়কে এদের কাছে সরস করে তুলতে হবে যাতে সহজে বুঝতে পারে এবং বেশী দিন মনে রাখতে পারে। এই উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন যেখানে শুধু এদের উপযোগী বই থাকবে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার করতে পারলে খুব ভাল হয়। বয়স্কা স্ত্রীলোকদের জন্যে আবার বিশেষ প্রচেষ্টার দরকার। কারণ এরা অনেকেই এ বয়সে লেখাপড়া শেখার পক্ষপাতী নয়। আর একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পঁচিশজনের বেশী লোককে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া না হয়। আবার যাঁরা বয়স্কশিক্ষার গুরুভার গ্রহণ করবেন তাঁদেরও এ বিষয়ে ট্রেনিং নিতে হবে ভালভাবে। অতএব অন্ততঃ পাঁচ বছরের আগে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয়।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার স্তর থেকে বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার কথা বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্যে চারটি ট্রেনিং স্কুল এবং একটি ট্রেনিং কলেজের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। শিশু-বিদ্যালয় এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ত্রিশজন শিক্ষার্থীর জন্যে এক জন শিক্ষক প্রয়োজন। আর উচ্চ বুনিয়াদী এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাক্রমে পঁচিশ ও কুড়িটি ছেলেমেয়ের জন্যে এক এক জন শিক্ষকের প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে শিক্ষাদান কার্যকে উপযুক্ত লোকের গ্রহণযোগ্য পেশা করে তোলা। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতন এতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে প্রাথমিক

স্তরে যাঁরা শিক্ষকতা করবেন তাঁদেরই বেতন হওয়া উচিত ত্রিশ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাশ টাকা। এই অনুপাতে অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদেরও বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি শিক্ষা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর টিফিন দেবার ব্যবস্থা করতে এবং মধ্যে মধ্যে চিকিৎসক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। প্রয়োজন হলে চিকিৎসার দায়িত্বও নিতে হবে। বিদ্যালয়ে যাতে প্রচুর খেলাধূলো এবং ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই হল সংক্ষেপে সার্জেণ্ট রিপোর্ট অথবা ভারতের যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরিকল্পনার বিবরণ। পরিকল্পনা হিসেবে এটি সর্বাঙ্গপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সন্দেহ নেই। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কথা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করে এগুলির উন্নতিসাধনের নির্দেশ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করতে গেলে প্রয়োজন বিপুল অর্থের ও দীর্ঘ সময়ের। এটিকে কার্যকরী করতে হলে প্রায় চারশ' কোটি টাকারও বেশী অর্থ চাই। বোর্ড যে হারে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলেছেন তাতে শুধু প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্যেই প্রয়োজন আটাশ কোটি টাকার আর সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে লাগবে চল্লিশ কোটি টাকা। কিন্তু ভারতের মত গরীব দেশে এত টাকা আসবে কোথা থেকে? সমগ্র ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে বছরে মাত্র তেত্রিশ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হয়। টাকার পরই সমস্যা হচ্ছে সময়ের। সার্জেণ্ট পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষা সংস্কার করতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর। সার্জেণ্টের মতে পরিকল্পনার নির্দেশমত কাজ আরম্ভ করতে প্রথম পাঁচ বছর যাবে। এর মধ্যে একদল শিক্ষক ট্রেনিং নিয়ে তৈরী হয়ে উঠবে। তখন তাদের নিয়ে কাজ

শুরু হবে। তার পর প্রতি বছর ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাও যেমন বাড়বে সংস্কারকার্যও তেমনি অগ্রসর হবে। কিন্তু ভারতের মত শিক্ষাব্যাপারে অনগ্রসর দেশের পক্ষে এতদিন অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়।

কিন্তু ঠিক ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে ভারতের মত বিরাট দেশকে শিক্ষার দিক দিয়ে অন্যান্য অগ্রসর দেশের সমতুল্য করতে গেলে সার্জেণ্ট পরিকল্পনানুযায়ী টাকার পরিমাণ এবং সময়ের দীর্ঘতা কোনটাই বেশী নয়। এখানে লোকসংখ্যা হচ্ছে চল্লিশ কোটিরও বেশী। এতগুলি লোককে যথার্থ শিক্ষাদান করতে গেলে সময় ও অর্থ দু'য়েরই প্রয়োজন। অবশ্য এ কথা ঠিক, পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছে ইংলণ্ডের আদর্শে। এদেশের প্রয়োজন এবং অভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়নি। তবুও স্বীকার করতে হবে এতে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া হয়েছে। এটিকে কার্যকরী করতে পারলে ভারতের নিরক্ষরতা দূরীকরণ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষার সকল স্তরেরই উন্নতি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব স্বাধীন ভারতে এখন প্রয়োজন পরিকল্পনাটির কাঠামো ঠিক রেখে যাতে অল্প সময়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম টাকায় এটি কার্যকরী করা যায় তার ব্যবস্থা করা। যেমন শিশু-বিদ্যালয়ের প্রবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কারের দায়িত্ব এখন গ্রহণ না করলেই চলবে। প্রয়োজন হচ্ছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বয়স্কশিক্ষার সুব্যবস্থা করা। আবার আট বছরের আবশ্যিক শিক্ষাকালটি কিছু কমান যায় অর্থাৎ ওটি ছ'বছর থেকে না করে সাত কিংবা আট বছর বয়স থেকে শুরু করা যায়। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই বয়স থেকেই শিশুদের সব রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। অবশ্য সামর্থ্যে কুলোলে ছোটবয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের উপযোগিতাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের যে সামর্থ্যেরই

অভাব। অতএব কিছু ক্ষতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই এখন সংস্কার করার প্রয়োজন নেই। পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হলে যখন এদেশে শিক্ষার জন্যে মাথা পিছু দশ টাকার কম খরচ হবে তখনই পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ আরম্ভ করা যাবে। এখন আংশিক হলেও দেশের মঙ্গল।

দ্বিতীয় ভাগ

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পরিকল্পনা—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের (মুদালিয়র কমিশনের) বিবরণী।

ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বিবরণী

অবতরণিকা

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের গোড়ার কথা—১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (The Central Advisory Board of Education) এর চতুর্দশ অধিবেশনে ভারত সরকারকে দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার দোষগুণ বিচার করে এর পুনর্গঠন ও উন্নতি সাধনের উপযোগী নির্দেশদানের জন্যে একটি কমিশন নিয়োগের পরামর্শ দেন। ১৯৫১ সালের অধিবেশনে সমিতি পুনরায় পূর্বোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে যতশীঘ্র সম্ভব প্রস্তাবানুযায়ী কমিশন নিয়োগের জন্যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যাদির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এমন কি শিল্পশিক্ষার উন্নতি সাধনের ও সুযোগসুবিধার সংগতি রক্ষারও উপায় নির্ণীত হয়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাদির সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করা হয় নি। অথচ এই স্তরেই অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে, আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই তৈরী হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকারী বিদ্যার্থী। অতএব এই স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা উপযুক্ত না হলে অন্যান্য স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাও উন্নত হতে পারে না। তাছাড়া প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বতোভাবে তত্ত্বমূলক ও এক-পক্ষীয় হওয়ায় এই স্তরের বিভিন্ন রুচি ও আবেগপ্রবণতাসম্পন্ন নব-

যৌবনোন্মুখ বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন প্রকারের দাবী এই শিক্ষাব্যবস্থা পূরণ করতে পারে না। উপরন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কতৃক প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ অনুমোদন লাভ করায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকেও বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। সেজন্যে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির পরামর্শমত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করাই স্থির করলেন এবং ১৯৫২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এরূপ একটি কমিশন নিয়োগও করলেন। এই কমিশনে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ, লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র, অক্স্‌ফোর্ডের জেসাস কলেজের অধ্যক্ষ জন ক্রিস্টি (John Christie), আট্‌লাণ্টার সাউদার্ণ রেজিন্যাল এডুকেশন বোর্ডের এসোসিয়েট ডিরেক্টর ডঃ কেনেথ রাস্ট উইলিয়ামস্ (Dr. Kenneth Rast Williams, Associate Director. Southern Regional Education Board, Atlanta, U. S. A), বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীমতী হংস মেটা, বোম্বাই সরকারের শিল্পশিক্ষার অধিকর্তা শ্রী জে, এ, তারাপোরভেলা (Shri J. A. Taraporevala), উদয়পুরের বিদ্যাভবন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কে, এল, শ্রীমালি, বোম্বাইয়ের নিউ এরা স্কুলের (New Era School, Bombay) অধ্যক্ষ শ্রী এম, টি, ব্যাস (Shri M. T. Vyas), ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রী কে, জি, সৈয়িদ্দিন (Shri K. G. Saiyidain), (এক্স্‌ অফিসিও মেম্বার) এবং সেণ্ট্রাল ইন্‌স্‌টিট্যুট অফ এডুকেশনের অধ্যক্ষ শ্রী এ, এন, বসু (মেম্বার সেক্রেটারী) প্রমুখ ন'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এ, লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র কমিশনের সভাপতিত্ব করেন এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এডুকেশন অফিসার ডঃ এস,

এম, এস, চারী কমিশনের সহকারী সেক্রেটারী রূপে সহযোগিতা করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার অনুধাবনে কমিশনকে সাহায্য করার জন্যে অতিরিক্ত সতের জন প্রাদেশিক প্রতিনিধি কমিশনের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কমিশনের ওপর প্রধান দুটি কর্তব্য অর্পিত হয়েছিল, প্রথমে, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে দেশের সর্বত্র প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন অবস্থার বর্তমান পরিস্থিতির যথাযথ বিবরণ দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, সংগঠন ও পাঠ্যবিষয় কি হওয়া উচিত, সেই সঙ্গে প্রাথমিক, বুনিয়াদী এবং উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধ ও বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং এই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্য সমস্যাগুলির যথোচিত অনুধাবন করে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নতি সাধনের উপযোগী নির্দেশদান করা, যাতে সমগ্র দেশের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের অনুরূপ এবং যতদূর সম্ভব এক ধরণের ও নিখুঁত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা যায়। ১৯৫২ সালের ৬ই অক্টোবর নয়াদিল্লীতে (তৎকালীন) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কমিশনের উদ্বোধন করেন। কমিশনও অবিলম্বে তাঁদের কার্যক্রম নির্ধারণে ব্যাপৃত হন। কতিপয় প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের পরামর্শমত কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা সম্বন্ধীয় প্রশ্নশ্রেণী (উত্তরের জন্যে স্থান রেখে) দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কার্যনির্বাহক এবং জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। প্রশ্নশ্রেণীতে ব্যাপকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের প্রশ্ন করা হয়েছিল, অতএব সকলের পক্ষে সব প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কমিশন যাঁদের কাছে প্রশ্নশ্রেণী পাঠালেন তাঁদের অনুরোধ করলেন কেবল মাত্র যে সকল বিষয়ের প্রতি তাঁদের আগ্রহ বেশী ও যেগুলি সম্বন্ধে তাঁদের

বিশেষ জ্ঞান আছে সেইগুলিরই উত্তর দিয়ে যেন কমিশনকে তাঁরা সাহায্য করেন।

প্রশ্নশ্রেণীতে আটটি পরিচ্ছেদে মাধ্যমিকশিক্ষার (১) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, (২) সংগঠন ব্যবস্থা, (৩) পরিচালন ও পরিদর্শন ব্যবস্থা, (৪) পাঠক্রম (৫) শিক্ষাদান প্রণালী, (৬) পরীক্ষণ, মূল্য নিরূপণ ও পরিচালন ব্যবস্থা, (৭) শিক্ষক ও শিক্ষকতার অবস্থা এবং শর্ত ও (৮) আর্থিক বিষয়ক নানারকম প্রশ্ন করা হয়েছিল। নিম্নে প্রশ্নশ্রেণীর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :—

(১) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয়—(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? প্রাথমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য কি? বস্তুতঃ শিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটা কার্যে পরিণত করা হয়েছে?

(খ) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান প্রধান দোষত্রুটিগুলি উল্লেখ করুন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কতটা উপযোগী? প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন কিভাবে সম্ভব? ইত্যাদি—

(২) সংগঠন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয়—(ক) আপনার প্রদেশে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার স্থিতিকাল কতদিন? কত বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশানুমতি লাভের নির্দিষ্ট বয়স থাকা উচিত কিনা, উচিত হলে নির্ধারিত বয়স কোন্ স্তরে কত হবে?

(খ) শিক্ষার বিভিন্নস্তরের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি রকম হওয়া উচিত? একদিকে প্রাথমিক (বুনিয়াদী) স্তর অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সংযোগসাধন কিভাবে সম্ভব? ইত্যাদি—

(গ) প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিল্প এবং বৃত্তি শিক্ষার সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত? মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা? ইত্যাদি—

(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন রুচি, সামর্থ্য ও আবেগপ্রবণতা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে হলে কি বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে? অথবা একই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রুচি ও সামর্থ্যের অনুরূপ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের উপযোগী বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন? বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষালাভের জন্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু কোন্ স্তরে এই নির্বাচন করা হবে? শিল্প, বৃত্তি এবং বাণিজ্যিক বিদ্যালয় স্থাপনে কোন্ নীতি অনুসরণ করা উচিত? ইত্যাদি—

(ঙ) মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাব্‌লিক স্কুল এবং আবাসিক বিদ্যালয়ের স্থান কি হওয়া উচিত, কিভাবে এই দুই ধরণের বিদ্যালয়কে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগী করা যায়? পাব্‌লিক স্কুলের বৈশিষ্ট্যগুলি ডে-স্কুলে প্রবর্তন করা যায় কিনা?

(চ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশানুমতি লাভ নির্বাচন-সাপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা এবং নির্বাচন প্রথায় কোন্ নীতি অনুসরণ করা উচিত?

(ছ) বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা কিরূপ? এ বিষয়ে কোন্ নীতি অবলম্বন করা যায়?

(জ) ছাত্রাবাস একান্ত প্রয়োজনীয় কিনা?

(ঝ) বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এ সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন হলে কিভাবে তা করা যায় সবিস্তারে জানান। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালন ও পরিদর্শনব্যবস্থা সম্বন্ধীয়—(ক) বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষাদপ্তর এবং সরকারের সম্বন্ধ কি? সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী হওয়া প্রয়োজন কিনা? অথবা সবগুলিই কি সরকার পরিচালিত হওয়া আবশ্যক? কিংবা উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই কি প্রয়োজন আছে? মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব বহন করা উচিত কি প্রাদেশিক সরকারদের, অথবা লোক্যাল বডির কিংবা প্রাইভেট বডির কর্তব্য এ দায়িত্ব বহন করা? কারণ দেখিয়ে উত্তর দিন। ইত্যাদি—

(খ) বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অত্যাবশ্যক গুণাবলী কি কি হওয়া উচিত? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শনকার্য কিভাবে অধিকতর গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ করা যায়? পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে কর্মের বিনিময়করণ সমর্থন করেন কিনা? ইত্যাদি—

(৪) পাঠক্রম সম্বন্ধীয়—(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষাদান কর্তব্য? সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাকালের মধ্যে সকল বিষয় শিক্ষাদান উচিত কিনা; যদি উচিত না হয়; কোন্ স্তরে কোন্ বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির শিক্ষাদান শুরু করা হবে এবং কতদিন পর্যন্ত সেগুলির শিক্ষাদান চলবে? বালিকাদের জন্যে পৃথক এবং বিশেষ ধরণের পাঠক্রম প্রবর্তন করার প্রয়োজন থাকলে কি ধরণের পাঠক্রম নির্দিষ্ট করা উচিত?

(খ) বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত? জুনিয়র হাইস্কুল এবং সিনিয়র হাই স্কুলে কতগুলি ভাষা (আবশ্যিক অথবা ঐচ্ছিক রূপে) শিক্ষণীয়? ইংরেজী ভাষা কোন্ স্তর থেকে এবং কতদিন পর্যন্ত শেখানো হবে?

(গ) ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, অতএব মাধ্যমিক স্তরে (শিক্ষার সকল স্তরেই) কৃষিবিদ্যা একটি পাঠ্যবিষয় রূপে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা কর্তব্য, কিন্তু কোন্ স্তর থেকে এই বিষয়ের শিক্ষাদান শুরু হবে এবং কতদিন পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হবে ? ইত্যাদি—

(ঘ) পাঠ্য-বিষয় বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের জন্যে সপ্তাহে কত ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা যায় ? এ সকল ক্রিয়াকলাপের জন্যে অধিক সময়ের প্রয়োজন হলে আরও কত ঘণ্টা এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা উচিত ? ইত্যাদি—

(ঙ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নীতি ও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে করা উচিত ? কিভাবে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যার্থীদের জীবনে পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা যায় ? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে সমাজসেবা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব কিনা ? বিদ্যালয়ে Student Government জাতীয় প্রথা প্রবর্তন করা যায় কিনা ? ইত্যাদি, ইত্যাদি—

(৫) শিক্ষাদান প্রণালী বিষয়ক—(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালী সাধারণতঃ কিরূপ ? প্রচলিত শিক্ষাদান প্রণালীর পরিবর্তন আবশ্যক কিনা ? উপযুক্ত প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত ? বাড়ীতে অভ্যাস করার জন্যে লেখার এবং পড়ার কাজ সপ্তাহে প্রতিক্লাসের জন্যে কতটা করে নির্দিষ্ট করা উচিত ?

(খ) বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সুযোগসুবিধার উন্নতি করা যায় কিভাবে ? ইত্যাদি, ইত্যাদি—

(৬) পরীক্ষণ, মূল্য নিরূপণ ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয়—(ক) মাধ্যমিক স্তরে কতগুলি পাব্লিক এগজামিনেশন (বহিঃ পরীক্ষা) থাকা প্রয়োজন ? বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পরীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য কিনা ?

(খ) এসে টাইপ (Essay type) পরীক্ষা ব্যবস্থায় কি কি সুবিধা এবং অসুবিধা বিদ্যমান? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন ধরণের Objective test প্রবর্তন করা সম্ভব কিনা? শিক্ষার্থীদের এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে বাৎসরিক প্রমোশনের মূলসূত্র কি হওয়া উচিত? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বিষয়ক এবং শিক্ষা বিষয়ক পথ-নির্দ্দেশের ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়? ইত্যাদি—

(৭) শিক্ষক ও শিক্ষকতার অবস্থা এবং শর্ত সম্বন্ধীয়—(ক) প্রাথমিক বিভাগের, মধ্য বিভাগের এবং উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট গুণাবলী কোন্ স্তরের পক্ষে কিরূপ নির্ধারিত হয়েছে? অঙ্কন বিদ্যা, সামরিক বিদ্যা এবং হস্তদ্বারা সম্পাদিত শিল্পকর্ম প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কিরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন? সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ের, লোক্যাল বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতনক্রম কিরূপ?

(খ) শিক্ষকদের টিউয়িশন (tuition) অথবা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করার কোনও বিধিনিষেধ কিংবা নিয়মকানুন আছে কিনা? একজন শিক্ষক কতগুলি টিউয়িশন করতে পারেন তার কোন সীমাবন্ধন আছে কিনা? পার্ট-টাইম (part-time) শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলে এঁদের চাকুরীর শর্তাবলী কি? শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ উপায় গ্রহণযোগ্য। মাধমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলির উল্লেখ করে এগুলির সংশোধন কিভাবে সম্ভব তার নির্দেশ দিন। এই ব্যবস্থার কোন্ কোন্ বিষয়ের পরিবর্তন আপনার অভিপ্রেত?

(গ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা সর্বাধিক কত ঘণ্টা কাজ করবেন? শ্রেণীতে সর্বাধিক কতগুলি শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষক

ভালভাবে পড়াতে পারেন ? অথবা একজন শিক্ষকের পক্ষে ভালভাবে পড়াতে হলে শ্রেণীতে সর্বাধিক কতগুলি শিক্ষার্থী থাকা প্রয়োজন ? ইত্যাদি, ইত্যাদি—

(৮) আর্থিক বিষয়ক—(ক) দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপযুক্তভাবে কাজ করার মত আর্থিক সামর্থ্য আছে বলে কি মনে করেন ? বর্তমানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারেরা যে ভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন তা যথেষ্ট কিনা ? এই সাহায্যদান নিয়মিত করতে হলে এবং প্রদত্ত সাহায্য ঠিকমত ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সরকার পক্ষ থেকে লক্ষ্য রাখতে হলে কি করা প্রয়োজন ? ইত্যাদি—

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা যায় কিনা ? তা সম্ভব না হলে দরিদ্র মেধাবী বিদ্যার্থীরা যাতে কেবলমাত্র দারিদ্র্যতাবশতঃ মাধ্যমিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয় সে ব্যবস্থা কিভাবে করা কর্তব্য ?

(গ) বর্তমানে যে হারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেতন এবং পরীক্ষার ফি লওয়া হয় তাহা যুক্তিসঙ্গত কিনা ? প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করা যায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

এ ধরণের প্রশ্নশ্রেণীতে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রায় সকল সমস্যার বিষয় আলোচিত হয়েছিল এবং যাঁদের কাছে প্রশ্নশ্রেণী পাঠানো হয় তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমস্যাগুলির সমাধানের উপায়ও জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া, কমিশন বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করে দেশের সর্বত্র প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন। যদিও সংক্ষিপ্ত সময়বশতঃ সকল প্রদেশ এই উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় নি, তথাপি যে সকল প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার

পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ঘটেছিল তা থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বহু সমস্যাই মোটামুটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় প্রায় কমিশনকে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে—ভারতীয় সংবিধানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারদের ওপর ন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও কি কারণে কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় কমিশন নিয়োগ করলেন? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। তাই কমিশন প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তরে সর্বভারতীয় কমিশন নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয় স্পষ্টভাবে আলোচনা করলেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের যুবসম্প্রদায়কে উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলা যারা সামাজিক পুনর্গঠনে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সক্রিয়ভাবে ও যোগ্যতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। অতএব স্বভাবতঃ দেশের যুবসম্প্রদায়কে ঠিক কি ধরণের শিক্ষাদান কর্তব্য তাহা নির্ধারণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরই ন্যস্ত। তাছাড়া, উচ্চতর শিক্ষার যথোচিত মান বজায় রাখার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারেরই, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করতে পারলে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি-সাধনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকারেই উপেক্ষা করতে পারে না। যথার্থরূপে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য দেশের প্রতিটি ব্যক্তি যাতে দায়িত্বশীল এবং সহযোগিতা করার মনোভাবসম্পন্ন নাগরিকের দায়িত্ব পালনের উপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা এবং যোগ্যতা লাভ করতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া, সেজন্যে ভারতীয় সংবিধানে চোদ্দ বছর (১৪ বৎসর)

বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক নাগরিকের অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা-লাভের অধিকার স্বীকৃতিলাভও করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দেশবাসীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক করে তোলার দায়িত্বও স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় তাদের সামাজিক গুণের বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি এবং ব্যবহারিক কর্মদক্ষ করে তোলার উপযোগী সুষম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই করতে হবে।

কমিশনের মতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনায়, বিশেষ করে এর আর্থিক প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা এবং সহযোজন একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু কতকগুলি বিষয়ে যেমন, শিক্ষকদের শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানদানের ব্যবস্থায় শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরীক্ষাদি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণে, উন্নত ধরণের পুস্তকাদি রচনা এবং নির্বাচনের ব্যাপারে ও যন্ত্রবিদ্ ও কলাকুশল ব্যক্তিদের ট্রেনিং দানের ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশী। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শারীরিক উন্নতি সাধনের ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পূর্বেই এন, সি, সি, অথবা ন্যাশান্যাল ক্যাডেট্ কোরের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারদের ওপর অর্পিত হলেও এবং এবিষয়ে প্রাদেশিক সরকারদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকলেও সমগ্র দেশের এবং সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধন করতে হলে দেশের শাক্ষব্যবস্থার পুনর্গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনায়কত্ব, পরিচালনা এবং সহযোগিতা অপরিহার্য।

সাক্ষাৎকারের সময় কমিশনকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রশ্নটি ভাষা সংক্রান্ত, অর্থাৎ নবপরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষার বিশেষ করে ইংরেজী এবং

হিন্দীভাষার স্থান কি হওয়া উচিত? এ সম্বন্ধে নানা পরস্পর বিরোধী এবং গোলমেলে মতবাদের সঙ্গেও কমিশনের পরিচয় ঘটেছিল। কমিশনের মতে এধরণের পরস্পরবিরোধী ও বিশৃঙ্খলসৃষ্টিকারী মতবাদ থেকেই সৃষ্টি হয় প্রাদেশিকতা, ধর্মের গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক দলাদলি। সেজন্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ উন্নতি সাধন করতে হলে ভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী মতবাদের প্রশ্রয় না দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। স্থানান্তরে কমিশন এবিষয় বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের পূর্বে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের জন্যে আরও কয়েকটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী কমিশনদের বহু মূল্যবান সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করা হয় নি।

সেজন্যে বর্তমান শিক্ষাকমিশনের সুপারিশগুলিও হয়ত কার্যে পরিণত করা হবে না বলে অনেকে সেসময়ে সন্দেহ প্রকাশও করেছিলেন। কমিশনের মতে সেকালের কমিশনগুলির সুপারিশ সমূহ অগ্রাহ্য করেছিল বিদেশী সরকার। আর এখন স্বাধীন ভারতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় মূল্যবান পরামর্শ মত কাজ করার দায়িত্ব জনসাধারণের এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। তাছাড়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ নিয়েছে। তাই কমিশনের সুপারিশ যদি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহ'লে সেগুলি কার্যে পরিণত করা দেশীয় সরকারের প্রধান এবং প্রথম কর্তব্য হবে বলেই কমিশন মনে করেছিলেন।

—এক—

প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত।

কোনও বস্তু বা বিষয়ের পরিশোধন এবং পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে সেই বস্তু বা বিষয়ের উৎপত্তি এবং বিকাশের ঐতিহাসিক অথবা ধারাবাহিক আলোচনার দ্বারা কোন্ পরিস্থিতিতে এর উৎপত্তি, সংশোধনযোগ্য দোষত্রুটিগুলি এবং পরিবর্তনযোগ্য বর্তমান অবস্থার কারণই বা কি, সর্বাগ্রে নির্ণয় করা প্রয়োজন। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থারও যথাযথ মূল্য নিরূপণ করতে হলে আদিপর্ব থেকেই তার বিশ্লেষণ করা উচিত। কমিশনও তাই কখন ও কোন্ পরিস্থিতিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল, কিভাবে এর ক্রমবিকাশ ঘটল এবং গত পঞ্চাশ বছরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রা এর পুনর্গঠনের বিষয় কিভাবে চিন্তা করে এসেছেন জানবার উদ্দেশ্যে প্রথমে পূর্ববর্তী শিক্ষাকমিশন ও শিল্পকমিটিগুলির বিবরণী ও সুপারিশসমূহ এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক সরকারী প্রস্তাবগুলির আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ঐ সময় দেশের তৎকালীন শাসন কর্তৃপক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার সময়োপযোগী পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সেকালের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা করেন। তখনকার শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা ছিল দেশবাসীকে ঠিক কি ধরণের শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য তাহা নির্ধারণ করা। এ সম্বন্ধে মত বিরোধেরও অন্ত ছিল না। কেউ কেউ প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে দেশবাসীকে প্রাচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন, আবার কেউ কেউ চেয়েছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেশবাসীকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত

করতে। অবশেষে মেকলে প্রমুখ ব্যক্তিদের পরামর্শে সেকালের লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের কতৃত্বাধীন সরকার ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার যাতে হয় তারই ব্যবস্থা করলেন। এই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বিদ্যালয়ও স্থাপিত হতে লাগল। আর রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কতিপয় ইংরেজী শিক্ষার অনুরাগী দেশীয় ব্যক্তিদের উৎসাহে অবিলম্বে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে পুনর্গঠন করা হয়।

এই নব্য শিক্ষাব্যবস্থার জনচিত্ত জয় করার অন্য আরও একটি কারণ ছিল। ১৮৪৪ সালে Lord Hardingeএর এক নির্দেশের ফলে সরকারী কাজকর্মে ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হতে লাগল। আর কার্যতঃ নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির কাজ হল শিক্ষার্থীদের সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মত উপযুক্ত করে তৈরী করা। দেখা যাচ্ছে প্রথম থেকেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। বিদ্যার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের প্রয়াস, এবং তাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার মত উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই এতে ছিল না। অতএব প্রথম থেকেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে পারে নি। তাই বার বার এর পর্যালোচনা এবং পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়েছে।

১৮৫৩ সালে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয় যেগুলির প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে এর ব্যাপক অনুসন্ধান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সার চার্লস্ উড সমস্যাগুলির অনুধাবন করে এক ডেসপ্যাচে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে

কতকগুলি নির্দেশ দেন। উডের ডেসপ্যাচেই সর্বপ্রথম এক এক জন দায়িত্বশীল ডিরেক্টর অফ পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্শনের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র জনশিক্ষা দপ্তর (ডিপার্টমেণ্ট অফ পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্শন) খোলার কথা বলা হয়। ডেসপ্যাচের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হল শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রী বিতরণের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা কলিকাতায়, বোম্বাইএ এবং প্রয়োজন হলে মাদ্রাজেও। এছাড়া, কতকগুলি উচ্চ বিদ্যালয় (High Schools) স্থাপন করার এবং জনসাধারণকে জীবনের সর্বাবস্থার উপযোগী ব্যবহারিক জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করার কথাও ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল। তৎকালীন ভারত সরকার ডেসপ্যাচের নির্দেশ মেনে নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করলেন। শিক্ষাবিভাগ বা স্বতন্ত্র শিক্ষাদপ্তরও গঠন করা হল এবং ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা বহুলাংশে সঙ্কুচিত হল। এই স্তরের শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীদের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযুক্ত স্বাবলম্বী করে তোলার মত স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা হওয়ার বদলে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে বিদ্যার্থীদের প্রবেশানুমতি লাভের উপায় মাত্র। সংক্ষেপে বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সর্বতোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কতৃক নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। ফলে, ১৮৫৪-১৮৮২ সালের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আবার কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হল। বিশেষ করে এযাবৎ শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষার দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে এসেছে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থাও এযাবৎ করা হয় নি। আর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কোনরকম বৃত্তিমূলক অথবা কারিগরি শিক্ষার

ব্যবস্থা না থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা হয়ে উঠেছিল বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একান্ত পুঁথিগত বিদ্যার্জন মাত্র। তার ওপর এসময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রভাব শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা নয় প্রাথমিক শিক্ষার ওপরও পড়তে শুরু করেছিল। তাই সরকার পুনরায় ১৮৮২ সালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এক কমিশন নিয়োগ করলেন। শিক্ষাজগতে এই কমিশন হাণ্টার কমিশন নামে পরিচিত। কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান করে মন্তব্য করলেন যে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই প্রাথমিক বিদ্যালাভের পর বড়জোর মধ্য অথবা উচ্চ বিদ্যালয়ে পর্যন্ত শিক্ষা-লাভের সুযোগ ঘটে, এর বেশী অগ্রসর হওয়া অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব এই স্তরে তাদের যতদূর সম্ভব পুর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এসম্বন্ধে কমিশন কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশও দিলেন। পরবর্তীকালের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রবর্তিত বহুমুখী শিক্ষাদান ব্যবস্থার পূর্বাভাষ হাণ্টার কমিশনের নির্দেশে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষাদান সম্বন্ধে কমিশন পরামর্শ দিলেন উচ্চবিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শ্রেণীতে দুটি বিভাগে দু'ধরণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে, একটি বিভাগে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরিক্ষার জন্যে তৈরী করা হবে, অপরটিতে থাকবে বৃত্তিমূলক এবং ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিমূলক পেশা গ্রহণের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে।

এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনা সম্বন্ধে কমিশন বল্লেন সরকারের পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করা বহু-ব্যয়সাপেক্ষ, তাই সরকার শুধু প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনমত সাহায্য দান ছাড়া প্রত্যক্ষ কোন দায়িত্বই সরকারের থাকবে না।

দুঃখের বিষয় তৎকালীন সরকার অথবা জনসাধারণ কেউই হাণ্টার কমিশনের সুনির্দিষ্ট পরামর্শগুলির ওপর যথোচিত গুরুত্ব না দেওয়ায় কমিশনের সুপারিশমত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টাও কার্যতঃ করা হয় নি। তা সত্বেও সরকারী সাহায্যদান নীতির ফলে এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ১৮৮২-১৯০২ সালের মধ্যে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল বলা যায়, কিন্তু এর মূল সমস্যাগুলির সমাধান না হওয়ায় শুধু মাত্র ব্যাপক প্রসারের দ্বারা শিক্ষাদানের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া দূরের কথা বরং আরও কতকগুলি অসুবিধারই সৃষ্টি হল।

১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করা হল সে সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন ও কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই কমিশনের সুপারিশের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকতর বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীন হয়ে পড়ল। ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ বাধ্যতামূলক করা হল এবং এরজন্যে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীয় প্রণীত হল।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ বা বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশনের সৃষ্টি হল। এই পর্যদ বা বোর্ডের কাজ হল মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যতালিকা নির্ণয়ের নির্দেশ দান এবং বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করা। আর এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্রে অথবা সেকেণ্ডারী স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতির এবং শিক্ষাসমাপ্তির পর গৃহীত বহিঃপরীক্ষার বা পাব্‌লিক এগজ্যামিনেসনের ফলাফলের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হবে বলেও স্থির করা হল, যাতে এই প্রমাণপত্র

দেখে কলেজের অধ্যক্ষেরা শিক্ষার্থীর যোগ্যতার অনুরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারেন আর যারা কলকারখানার কাজে যোগ দিতে যাবে তাদের মালিকেরাও এই প্রমাণপত্র দেখেই স্থির করবেন কি ধরণের কাজ তাদের দ্বারা সুসম্পন্ন হতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে পরলোকগত স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে পুনরায় এক শিক্ষা কমিশন গঠিত হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হলেও স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা করে এর উন্নতি সাধনের জন্যে মূল্যবান নির্দেশ দিলেন। কারণ কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যথার্থ উন্নতি সাধন করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন একান্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের উল্লেখযোগ্য নির্দেশ হল :—

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তি প্রবেশিকা পরীক্ষার পর না হয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পর হওয়াই সমীচীন। সেজন্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল আরও দু'বছর বাড়াতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুরু হবে এই দু'বছর পর অর্থাৎ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর।

(২) এই উদ্দেশ্যে সরকারকে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ নামে নতুন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এই সব প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, পূর্ত্তাদি কার্যবিষয়ক বিদ্যা, শিক্ষকতা প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানদানের ব্যবস্থা থাকবে। আর প্রতিষ্ঠানগুলি হয় স্বাধীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রূপে অথবা উচ্চবিদ্যালয়গুলির সংশ্লিষ্ট হয়ে পরিচালিত হবে।

(৩) কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনা আদৌ সমর্থন করলেন না। তাই নির্দেশ দিলেন দেশের

শাসনকর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এবং সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্যে। যেহেতু ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাকালকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে উক্ত বোর্ড ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষারও পরিচালনা করবে এবং বোর্ডের নাম হবে বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এ্যাণ্ড ইণ্টারমিডিয়েট এডুকেশন।

প্রধানত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাসমাধানের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও স্যাড্‌লার কমিশন দেশব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনের কথাই চিন্তা এবং আলোচনা করেছিলেন। তাই শিক্ষাব্যবস্থাসম্বন্ধীয় কমিশনের পরামর্শগুলিও হয়েছিল বহুপ্রসারী এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও কমিশনের সুপারিশমত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করতে শুরু করেছিল।

স্যাড্‌লার কমিশনই প্রথম ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার কথা এবং উচ্চবিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার পরিচালনার জন্যে একটি শিক্ষাপর্ষদ বা বোর্ড অফ এডুকেশন গঠনের কথা বলেন।

পরবর্তী কয়েক বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার বহুল প্রসার হল এবং সহর ও গ্রামাঞ্চলের বহু বদান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে লাগল। কিন্তু শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে উপযুক্ত ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা এবং তাঁদের বেতন ও চাকুরীর শর্তাবলী সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির কোন মীমাংসাই হল না। তা ছাড়া তত্ত্বমূলক ও কেতাবী মাধ্যমিক শিক্ষার অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে কারিগরি অথবা শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন কিংবা উচ্চবিদ্যালয়ে দ্বিমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হতে লাগল।

১৯২৯ সালে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ এবং পুনর্গঠনের ভার পড়ল হার্টগ কমিটির ওপর। কমিটি অনুসন্ধান করে দেখলেন তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। কোনরকমে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ছিল শিক্ষার্থীদের একমাত্র লক্ষ্য। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে বিদ্যালয়ে অধিকতর বৈচিত্রপূর্ণ বিবিধ পাঠক্রমের প্রবর্তন করার কথা কমিটি বল্লেন। আর বিদ্যার্থীদের মধ্যে যাদের কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের আগ্রহ বেশী তাদের মধ্য বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত কেতাবী শিক্ষা দিয়ে তারপর শিল্প ও বাণিজ্যিক বিদ্যালয়ে প্রবেশানুমতি লাভের উপযুক্ত করে তোলার নির্দেশ দিলেন। শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা এবং তাঁদের চাকুরীর অবস্থা ও শর্তাবলীর বিষয় আলোচনা করে কমিটি মন্তব্য করলেন ন'মাসের মত স্বল্পসময়ের মধ্যে শিক্ষকদের সম্পূর্ণ এক নতুন শিক্ষাদানপদ্ধতির জ্ঞানদান সম্ভব নয়। এত অল্পসময়ের মধ্যে অভ্যস্ত পুরনো পদ্ধতির স্মৃতিও শিক্ষকদের মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। আর শিক্ষকদের চাকুরীর অবস্থা সম্বন্ধে বল্লেন শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং চাকুরীর শর্তাবলী সন্তোষজনক না হওয়া পর্যন্ত কোন ভাল ছাত্র কিংবা যথেষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষকতা পেশারূপে গ্রহণ করতে চাইবে না।

১৯৩৪ সালে উত্তর প্রদেশের সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাপ্রু কমিটিও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বল্লেন। উত্তর প্রদেশের বেকার সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করে কমিটি মন্তব্য করলেন দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্যেই বেকার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের উপযোগী শিক্ষা না দিয়ে শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং ডিগ্রীলাভ করার জন্যেই শিক্ষা দেওয়া হয়। আর জনসাধারণের বেকার অবস্থাই হচ্ছে দেশের

যাবতীয় অশান্তি এবং বিক্ষোভের কারণ। কমিটির মতে এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করে এই স্তরের শিক্ষাকে অধিকতর ব্যবহারিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন বিশ্ববিত্তালয়ে প্রবেশানুমতি লাভের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে অপরদিকে শিল্পবাণিজ্যিক প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও থাকবে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে। কমিটি আরও বল্লেন ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নেই বরং মাধ্যমিক শিক্ষাকাল আরও একবছর বাড়াতে হবে এবং এই ছ'বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে উচ্চতর মাধ্যমিক এবং নিম্নতর মাধ্যমিক স্তরে বিভক্ত করে প্রতি স্তরে তিন বছর করে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে। তাহলে সমগ্র শিক্ষাকাল হবে মোট এগার বছরের, প্রথম পাঁচ বছর প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে আর বাকী ছ'বছর থাকবে মাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্যে। নিম্নতর মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অর্থাৎ আট বছর ধরে সাধারণ পাঠক্রম অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হবে। তারপর অর্থাৎ নিম্নতর মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শুরু হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও ট্রেনিং। বিশ্ববিত্তালয়ের ডিগ্রী-কোর্সের শিক্ষাকালও একবছর বাড়িয়ে তিন বছর করতে হবে।

১৯৩৬-৩৭ সালে এ্যাবট এবং উড নামক দু'জন অভিজ্ঞ উপদেষ্টাকে আমন্ত্রণ জানানো হল শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্বন্ধে, বিশেষ করে, কি ভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় সে সম্বন্ধে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে। এসময়ে দেশে উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিত্তালয়ের শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল কিন্তু বিশ্ববিত্তালয়ের উপাধিধারী স্নাতকদের উপযুক্ত কর্ম যোগাড় করা একটা সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তারই জন্যে বলা যায় আবার শিক্ষাউপদেষ্টাদের

পরামর্শের প্রয়োজন হল। ব্যবহারিক শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাঁদের প্রশ্ন করা হল, প্রথমত, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়—এই তিন স্তরেই ব্যবহারিক অথবা বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে কিনা? যদি তিন স্তরেই শিক্ষা দিতে হয় তাহলে কি ধরণের এবং কোন্ স্তরে কতদূর পর্যন্ত এ শিক্ষা দেওয়া হবে? দ্বিতীয়ত, বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিল্পশিক্ষা অথবা বৃত্তিশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেগুলিরই উন্নতি সাধন করে নিলে চলবে কিনা? কিংবা শিল্পশিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে? যদি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হয় কি ধরণের হবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি? মাধ্যমিক শিক্ষার কোন্ স্তরের (নিম্নতর অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক?) শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি অথবা শিল্পশিক্ষা শুরু হবে? এবং কি উপায় অবলম্বনে শিক্ষার এই গতি পরিবর্তন করা হবে?

এ্যাবট এবং উড সাহেব তাঁদের রিপোর্টে ব্যবহারিকশিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে মূল্যবান নির্দেশ দিলেন। তাঁরা পরামর্শ দিলেন সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মত শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ক্রমানুসারে গঠিত করা প্রয়োজন। আর তাঁদেরই পরামর্শমত বিভিন্ন প্রদেশে শিল্প, বাণিজ্যিক ও কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের জন্যে উচ্চবিদ্যালয় এবং পলিটেক্‌নিক্ (নানাবিধ শিল্প) নামে নতুন শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল।

১৯৪৪ সালে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি অথবা সেণ্ট্রাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড অফ এডুকেশন কর্তৃক যুদ্ধোত্তর ভারতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে এক শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা করালেন। এই রিপোর্ট অথবা শিক্ষাপরিকল্পনা ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা স্যার জন সার্জেণ্টের

নামানুসারে সার্জেণ্ট রিপোর্ট অথবা সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত। রিপোর্টে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হল। এই আট বছরের অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাকালকে আবার নিম্নবুনিয়াদী এবং উচ্চবুনিয়াদী অথবা মধ্যবিদ্যালয় স্তর এই দু'ভাগে বিভক্ত করতে হবে। নিম্নবুনিয়াদী স্তরে ছয় থেকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হবে আর এগার থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ মধ্যবিদ্যালয়ে তিনবছর তাদের উচ্চ-বুনিয়াদী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণতঃ অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই বিদ্যালয়ের শিক্ষা এই উচ্চবুনিয়াদী বা মধ্যবিদ্যালয় স্তরে শেষ হয়। সেজন্যে এই স্তরে বহুবিধ পাঠক্রমের প্রবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের যোগ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষালাভের উপযোগী শিক্ষাদানের এবং শিল্পবাণিজ্যিক পেশা গ্রহণেচ্ছুক বিদ্যার্থীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার পরামর্শও রিপোর্টে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল ছ'বছরের জন্যে নির্দিষ্ট হল, এই স্তরে প্রবেশানুমতি লাভের সাধারণ বয়স এগার বছর বলেও ধার্য করা হল। সার্জেণ্ট রিপোর্টে দু'রকমের উচ্চবিদ্যালয়ের কথাও বলা হয়—(১) সাহিত্যবিষয়ক শিক্ষাদানের জন্যে জ্ঞানমুখী বিদ্যালয় এবং (২) যন্ত্র ও শিল্পশিক্ষার জন্যে থাকবে শিল্পমুখী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। উভয়বিধ বিদ্যালয়েতেই উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতে হবে সেইসঙ্গে উভয়বিধ বিদ্যালয়েই শেষের স্তরে শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে জীবিকানির্বাহের উপযোগী ব্যবহারিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এই হল সার্জেণ্ট রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ।

এরপর ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির পরামর্শমত সরকারের তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ তারাচাঁদের সভাপতিত্বে

পুনরায় এক কমিটি নিযুক্ত করলেন মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে। কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্যে কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ দিলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি ১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে পঞ্চদশ অধিবেশনে কমিটির রিপোর্ট নিয়ে অনেক আলোচনা করে স্থির করলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের জন্যে একটি কমিশন নিয়োগের জন্যে ভারত সরকারকে অনুরোধ করতে হবে। এই মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, আদর্শ এবং উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত ও একদিকে বুনিয়াদী শিক্ষা অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কিভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগস্থাপন করা যায় সে বিষয় পরামর্শ দেবেন। আর তারাচাঁদ কমিটির রিপোর্টের অমীমাংসিত প্রশ্নগুলির মীমাংসার ভারও মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের ওপর দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি স্থির করলেন। ১৯৫১ সালের অধিবেশনে সমিতি পুনরায় কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের পরামর্শমত ভারত সরকার ডঃ এস, রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশন নিয়োগ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কমিশন দেখলেন উচ্চশিক্ষা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে মতামত দিতে গেলে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করে এই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনের নির্দেশ দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের মতে "Our Secondary Education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reform."

তাই মাধ্যমিক শিক্ষাসম্বন্ধেও বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দিলেন। কমিশন বল্লেন বিদ্যালয়ে এবং ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজে মোট বারো বছর শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের অনুমতি দেওয়া হবে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারের ও জনসাধারণের উদাসীনতা লক্ষ্য করে কমিশন দুঃখ প্রকাশও করলেন।

এই হল মোটামুটি দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত। শিক্ষাব্যবস্থার এই ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রথম থেকেই মধ্যে মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিসাধনের ও পুনর্গঠনের চেষ্টা হয়ে আসছে। ১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশনের নির্দেশমত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা হলে মাধ্যমিক শিক্ষার রূপই অন্যরকম হতো এবং এতদিন পরে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের উপযোগিতা ও শিল্প, বাণিজ্যিক, কৃষিবিদ্যা এবং ঐ ধরণের অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ব্যবহারিক জীবনের প্রস্তুতি রূপে পুনর্গঠনের প্রশ্নই উঠতো না। যাইহোক, পূর্বোক্ত কমিটি এবং কমিশনগুলির বিবরণী থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

ইতিবৃত্ত আলোচনা করে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কারসাধন সম্বন্ধে মতামত দেবার আগে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হলেন। কমিশন দেখলেন শিক্ষার বিভিন্নস্তরের বিভেদ ছাড়াও প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রাকপ্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদেবার জন্যে কোনো কোনো

প্রদেশে নার্শারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে শিশুদের পরস্পরের সাহচর্য ও খেলাধূলোর মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। এধরণের বিদ্যালয়ে খেলাধূলোর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলেও এখানে শিশুদের কতকগুলি সদ্ভ্যাসের শিক্ষাও হয়। যেমন সামাজিক আচারব্যবহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সদ্ভ্যাসগুলির অনুশীলন হয়। অবশ্য এধরণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। কোথাও কোথাও নার্শারী বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবার কোথাও বা মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এগুলিতে কাজও খুব ভাল হয়। তবে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাল্পতাবশতঃ নার্শারী বিদ্যালয়ের আশানুরূপ প্রসার হচ্ছে না। এধরণের বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল কিন্তু সর্বত্র সমান নয়, কোনো কোনো প্রদেশে ৩ থেকে ৫ বছরের শিশুদের নার্শারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় অন্যত্র আবার ৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এরপর শুরু হয় প্রাথমিক এবং প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষাদান। এই স্তরের শিক্ষাকালও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরকম, কোথাও ৬ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত মোট ৪ বছর ধরে শিক্ষা দেওয়া হয় কোথাও আবার ৫ বছর ধরে অর্থাৎ ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এই স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা আরম্ভ হয় কোনো প্রদেশে ৬ থেকে ও কোনো প্রদেশে ৭ বছর বয়স থেকে। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অনুরূপ নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় অথবা জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রবর্তন বিভিন্ন প্রদেশে করা হয়েছে।

কতকগুলি প্রদেশে উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা হাইয়ার এলিমেণ্টারী স্কুলে প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা আছে। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। হাইয়ার এলিমেণ্টারী

স্কুলের শিক্ষাকাল হচ্ছে তিন বছর। তবে এধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে।

এরপর হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্যে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিম্নস্তর ও উচ্চস্তর অথবা জুনিয়র স্টেজ্ ও সিনিয়র স্টেজ্ এই দু'বিভাগে বিভক্ত। নিম্নতর অথবা জুনিয়র স্টেজ্‌কে কোথাও মধ্যবিদ্যালয় কিংবা নিম্নতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Lower Secondary School) বলা হয়ে থাকে। কোথাও আবার এই বিভাগ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা সিনিয়র বেসিক স্কুল নামে পরিচিত। শিক্ষাকাল কোনো প্রদেশে ৩ বছর আবার কোনো প্রদেশে ৪ বছর। তবে অধিকাংশ প্রদেশেই এই স্তরে তিন বছর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চস্তরকে উচ্চবিদ্যালয় অথবা হাই স্কুল বলা হয়ে থাকে, অধিকাংশ স্থানেই উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল তিন বছরের, তবে যে সকল প্রদেশে মধ্যবিদ্যালয়ে অথবা লোয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে চার বছর শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে এই স্তরে দু'বছরের শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সম্প্রতিকালে সৃষ্টি হয়েছে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অথবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের, এই স্তরেও কোথাও ৩ বছর এবং কোথাও ৪ বছর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের এক বছর মাধ্যমিক শিক্ষাকালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠছে।

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অথবা হাইয়ার এডুকেশন স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রায় সর্বত্র চার বছরের জন্যে নির্দিষ্ট, প্রথম দু'বছরে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের এবং অপর দু'বছরে ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু দিল্লীতে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ায়

তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের তখন প্রবর্তন হয়েছিল। আর মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন করার চেষ্টা চলছিল।

স্যাড্‌লার কমিশনের নির্দেশে বহু জায়গায়, বিশেষ করে উত্তর ভারতের অনেক প্রদেশে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষাদানের জন্যে। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে তু'বছর কাল শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কলেজগুলি বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এ্যাণ্ড ইণ্টারমিডিয়েট এডুকেশন দ্বারা পরিচালিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব থেকে এগুলি মুক্ত। কোনো কোনো প্রদেশে অবশ্য চার বছরের ডিগ্রী কোর্সকে সম্পূর্ণ তুটি আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, একটি ইণ্টার-মিডিয়েট কোর্সের জন্যে এবং অপরটি ডিগ্রী কোর্সের জন্যে নির্দিষ্ট। অধিকাংশ কলেজেই ইণ্টারমিডিয়েট থেকে ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত চার বছর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, তবে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় কোথাও কোথাও তু'বছরের ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আলাদা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজও স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়া আছে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষালাভের পর যারা ইঞ্জিনীয়ারিং, টেক্‌নোলজি, মেডিসিন, ভেটারিন্যারি সায়েন্স, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিদ্যার উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে চাইবে তাদের জন্যে বৃত্তিমূলক বা প্রাফেশান্যাল কলেজ এবং বারো বছর ও তদূর্ধ বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার জন্যে ট্রেড স্কুল, ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল স্কুল, অকিউপেশান্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুটস্‌ ও পলিটেক্‌নিকস্‌ 'জাতীয় শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিট্যুটস্‌। এসকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীরা কোন শিল্পবাণিজ্যে যোগ দিতে কিংবা স্বাধীন পেশা অবলম্বন করতে সক্ষম হয়।

বহু প্রদেশেই পলিটেক্‌নিক্‌স্‌ অথবা নানাবিধ শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধীয় শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষণীয় বৃত্তি বা পেশার বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী পলিটেক্নিক্সের শিক্ষাকালও সর্বত্র সমান নয়। কোনো কোনো প্রদেশে মধ্যবিদ্যালয় ও উচ্চ-বিদ্যালয় উভয়বিধ স্তরেই, বিশেষ করে উচ্চবিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের নিজের নিজের যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী, এগ্রিকালচার, টেক্নোলজি, আর্ট এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্, সেক্রেটেরিয়াল প্র্যাক্‌টিস্, ডোমেষ্টিক সায়েন্স ও হোম ক্র্যাফট্ অথবা সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয় ইত্যাদির বিভিন্ন ধারায় শিক্ষালাভের সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন যে সময় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তখন বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত ছিলই, অধিকন্তু বৃত্তি বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্যে বহু নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল।

—দুই—

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সময়োপযোগী শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির করা না হলে শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হতে পারে না। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গোড়া থেকেই ভ্রান্ত এবং সংকীর্ণ। পূর্ব অধ্যায়ে শিক্ষার ইতিবৃত্ত আলোচনা কালে দেখা গেছে দেশের তৎকালীন সরকারের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করানোর জন্যে কতিপয় দেশীয় ব্যক্তিকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসক দেশে নব্যশিক্ষার প্রচলন করেছিল। দেশবাসীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন করা কিংবা তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। মধ্যে মধ্যে অবশ্য প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারসাধনের এবং পুনর্গঠনের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু এযাবৎ দেশের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের অনুকূল শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তা সুসঙ্গত ও স্পষ্টভাবে নির্ধারিত না হওয়ায় সংস্কারসাধনের চেষ্টাও আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নি। তাই কমিশন যখন শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন অনেকেই এর ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করে বলেছেন এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে আলোচনা করে কমিশনও লক্ষ্য করলেন প্রথমতঃ, একান্তভাবে পুঁথিগত হওয়ায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন সম্বন্ধ নেই

বলা চলে। ফলে, দৈনন্দিন জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই বিদ্যার্থীরা এই শিক্ষার দ্বারা লাভ করতে পারে না, আর তাই শিক্ষার শেষে বিদ্যালয়ের বাইরে এসে তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযুক্ত হয়ে সমাজে নিজেদের ন্যায্য স্থানও অধিকার করতে পারে না। এর প্রতিকারকল্পে প্রয়োজন বিদ্যালয়কে একটি সমাজরূপে গড়ে তোলা বহির্জগৎ বা সমাজের সঙ্গে যার থাকবে নিবিড় সম্বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত শিক্ষায় কেবলমাত্র তত্ত্বমূলক ও তথ্যপূর্ণ উপদেশ দেবার ব্যবস্থাই করা হয়েছে, তাই এ শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং একমুখী। এতে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হয় মাত্র, তাদের স্বাভাবিক শক্তি, প্রবৃত্তি, প্রবণতা, আবেগ ও অনুভূতির অনুশীলনের সুযোগ না থাকায় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন করতে হলে প্রয়োজন বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীতে খেলাধুলো, হাতের কাজ এবং অন্যান্য পাঠ্যবিষয়বহির্ভুত বিষয়গুলি অপরিহার্য অঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত করা। তৃতীয়তঃ, কিছুদিন আগেও ইংরেজী ভাষা ছিল শিক্ষার মাধ্যম এবং একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ও। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়, এই ভাষার পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার গণ্ডী পার হওয়া কিংবা সরকারী চাকুরী লাভ করা। মনস্তত্বসম্মত এবং সামাজিক প্রয়োজনের অনুকূল বিষয়গুলির প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। চতুর্থতঃ, শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন যে এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশসাধন করা কিংবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন কাজ করার মত উৎসাহ তাদের মধ্যে সঞ্চার করা কোনটাই সম্ভব হয় না। এতে শিক্ষকেরা যন্ত্রবৎ কতকগুলি তত্ত্বমূলক সংবাদ শিক্ষার্থীদের জ্ঞাত করান মাত্র তারা কোনরকমে এগুলি মুখস্থ

করে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। পঞ্চমতঃ, প্রতিশ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। তাই শিক্ষকের পক্ষে "আপনি আচরি ধর্ম" ছাত্রকে নীতি শিক্ষা দেওয়া এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রেও শুধু পুঁথিগত উপদেশের সাহায্যে শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে এবং সমাজে যোগ্য মর্যাদা না পেয়ে শিক্ষকেরা ক্রমেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে, ছাত্রদের আদর্শস্থানীয় হবার যোগ্যতাও তাঁদের হ্রাস পাচ্ছে। অতএব শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনে শিক্ষকদের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করে সর্বপ্রথম শিক্ষকদের মনে আশা এবং উৎসাহের সঞ্চার করতে হবে। পরিশেষে বলা যায় প্রচলিত শিক্ষায় পরীক্ষণ ব্যবস্থার ওপর অযথা গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোনোরকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষালাভের আসল উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন কাজ করার অথবা কোন বিষয়ের পরীক্ষানিরীক্ষা করার সুযোগ শিক্ষকেরা পান না, দিনের পর দিন মামুলী পাঠক্রম অনুসরণ করে তাঁরা যন্ত্রবৎ শিক্ষার্থীদের পাঠ দিয়ে যান।

উপরোক্ত আলোচনায় শিক্ষাব্যবস্থার কেবল ত্রুটিবিচ্যুতির কথা বলা হলেও এ কথা মনে করা ভুল যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গুণবর্জিত কিংবা এ শিক্ষার দ্বারা দেশের কোনো উদ্দেশ্যই কখনও সাধিত হয় নি। সংশোধন দোষত্রুটিরই করা চলে আর শিক্ষাকমিশনের কর্তব্য সেই দোষত্রুটিগুলি সম্যক উপলব্ধি করে সেগুলির সংশোধনযোগ্য উপায় নির্ধারণ করা। কেবল সেজন্যেই কমিশনের বিবরণীতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গুণাবলীর উল্লেখ নেই।

মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের মতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের নবপরিকল্পিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রধানতঃ তিনটি, প্রথমতঃ, জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে তোলা. দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনদক্ষতার উৎকর্ষসাধনের দ্বারা প্রচ্ছন্নধনসম্পদপূর্ণ ভারতের জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি করে দারিদ্র্যনিপীড়িত দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের জন্যে, একান্ত প্রয়োজন জনসাধারণকে সংস্কৃতি ও কৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপের সাধনায় অনুপ্রাণিত করা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র, অতএব এরূপ রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব সামান্য নয়। এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন সামাজিক, নৈতিকবুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত কতকগুলি গুণের অনুশীলন করা। আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই এই গুণগুলির অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ অধিকাংশ ব্যক্তিরই বিধিবৎ শিক্ষালাভ বা ফরম্যাল্ এডুকেশন এই মাধ্যমিক স্তরেই শেষ হয়। এই স্তরেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের যথাযথ বিচারবিবেচনার ও সুনির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার শক্তি অর্জনে সহায়তা করা। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিল সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের বিজ্ঞানীসুলভ যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নবউদ্ভাবিত চিন্তাধারা ও বিষয়গুলিকে সহজে গ্রহণ করার মত মনের উদারতাও থাকা আবশ্যক। তবে নতুনকে তার অভিনবত্বের জন্যে গ্রহণ করার এবং পুরনোকে তার প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে ত্যাগ না করে

নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা যা ন্যায়নীতি এবং অগ্রগতির পরিপন্থী তাকেই বর্জন করার মত দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে। আবার সুনির্দিষ্ট ও যথাযথভাবে চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা করার শক্তি অর্জনের মতই প্রয়োজন কথা এবং লেখার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে নিজেকে অপরের কাছে ব্যক্ত করার ক্ষমতা লাভ করা। কারণ গণতন্ত্রে সকলের সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদা, তাই গণতন্ত্র গড়ে ওঠে পরস্পরের স্বচ্ছন্দ আলাপ আলোচনা, ও ভাব বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে। অতএব অপরকে প্রভাবিত করে সুস্থ জনমত গঠন করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই কথাবার্তা এবং লেখার মাধ্যমে নিজের ভাব স্পষ্ট করে ব্যক্ত করার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। তাছাড়া, সমাজবদ্ধজীব মানুষ হিসেবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়মানুবর্তিতা সহযোগিতা, সামাজিক সংবেদনশীলতা ও সহনশীলতা, এই বিশেষ চারটি গুণের অনুশীলন করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের মনে যথার্থ স্বদেশপ্রেম জাগানো, যথার্থ স্বদেশপ্রেমের লক্ষণ তিনটি .(১) নিজের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের যথাযথ গুণ বিচার, (২) এর দুর্বলতা ও দোষত্রুটি স্বীকার করার মত তৎপরতা, (৩) আর এই দোষত্রুটি সংশোধনের জন্যে সচেষ্ট হওয়া সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা তুচ্ছ করে এবং জাতীয় স্বার্থকে বড় করে দেখে যথাসাধ্য দেশের সেবা করার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হওয়া। আবার কেবল নিজের দেশকে ভালবাসাই এযুগে যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে আমরা সকলে এক বিশ্বের অধিবাসী এই উদার ভাবটি নাগরিক তথা শিক্ষার্থীদের মনে জাগানো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার অবশ্য কর্তব্য। উপরোক্ত সকল গুণগুলির বিকাশসাধনের স্থান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তবে চিরাচরিত শিক্ষাদান

প্রণালী ও শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান প্রণালীর আমূল পরিবর্তন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনদক্ষতার উৎকর্ষসাধন করতে হলে কর্ম সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে এই বোধটি জাগাতে হবে যে জাতীয় সমৃদ্ধি ও আত্মোন্নতি লাভের জন্যে প্রত্যেকের কর্ম করা একান্ত প্রয়োজন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করা উচিত। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজ যাতে শিক্ষার্থীরা এই মনোভাব নিয়ে করে শিক্ষকদের সে বিষয় সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, সেজন্যে তাদের উদ্দেশ্যহীন ও ত্রুটি পূর্ণ কাজ সর্বদা শিক্ষকরা দৃঢ়তা অথচ সহানুভূতির সঙ্গে প্রত্যাখান করবেন। কর্ম সম্বন্ধে এই ভাবের উদ্রেক করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সকল স্তরে শিল্পশিক্ষার উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থা করতে হবে শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার সহায়ক শিক্ষিত ও নিপুণ কর্মী তৈরী করার উদ্দেশ্যে; আর এর জন্যেই কমিশনের নির্দেশ বিদ্যালয়ে বহুমুখী শিক্ষাসূচীর প্রবর্তন করে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয় পঠন পাঠনের সুযোগ দেওয়া যাতে শিক্ষান্তে তারা ব্যবহারিক শিক্ষার উচ্চ জ্ঞান লাভ করতে অথবা প্রয়োজন হলে কোন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করতে পারে।

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনের জন্যে প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের মতই শিক্ষার্থীদের অন্যান্য সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগুলির, যেমন, আবেগ-অনুভূতি, চারুশিল্পপ্রিয়তা এবং সৃজনীশক্তি প্রভৃতির অনুশীলনেরও সুযোগ দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীতে চারুশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য এবং অন্যান্য চিত্তবিনোদনের উপযোগী ললিতকলাও অন্তর্ভুক্ত করা কর্তব্য।

উপসংহারে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নিজ নিজ সম্প্রদায় ও নির্দিষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষার্থীরা যাতে সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্পবাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের অধিনায়কত্ব অথবা পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হয় সেই ভাবে তাদের শিক্ষিত করে তোলা।

—তিন—

নবসংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ।

মাধ্যমিক শিক্ষা কেবল উচ্চশিক্ষালাভের প্রস্তুতি কিংবা উচ্চশিক্ষালাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎসংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে প্রবেশানুমতি লাভের উপায় মাত্র নয়। সেজন্যে এই স্তরের শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত করাই শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাসংস্কারকদের উদ্দেশ্য, কারণ এই স্তরেই অধিকাংশ ব্যক্তির বিধিবৎ শিক্ষা বা ফরম্যাল এডুকেশনের সমাপ্তি ঘটে। তাই এই স্তরেব শিক্ষায় তারা যাতে জীবিকাগত যোগ্যতাও অর্জন করতে পারে এবং শিক্ষাসমাপ্তির পর ইচ্ছে করলে কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করে জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে যেমন শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন তেমনি এই স্তরের শিক্ষাকাল অর্থাৎ কতদিন পর্যন্ত এই স্তরে শিক্ষালাভ করলে বয়স ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তারা জাবনের দায়িত্ব গ্রহণের কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষালাভের যোগ্য হতে পারে তাও নির্ণয় করা কর্তব্য বলে তাঁরা মনে করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্থিতিকাল।

অনেকেরই ধারণা প্রচলিত ব্যবস্থার নির্দিষ্ট শিক্ষাকাল যে বয়সে সমাপ্ত হয় ও এই সময়ের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানলাভ হয় তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশানুমতি লাভের কিংবা জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। উপরন্তু প্রস্তাবিত বহুমুখী পাঠক্রমের কতকগুলি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হলেও কমিশন মনে করেন এই স্তরের শিক্ষাকাল আরও কিছুদিন বাড়ানো প্রয়োজন। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন

শিক্ষাকাল এক বছর বাড়িয়ে মোট সাত বছরের অর্থাৎ ১১ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার পরামর্শ দিলেন। নবসংগঠিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ৪ কিংবা ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার (প্রাইমারী) অথবা নিম্নবুনিয়াদীশিক্ষার (জুনিয়র বেসিক) পর শুরু হবে ৭ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা। এই সাত বছরের শিক্ষাকালের মধ্যে ৩ বছর থাকবে মধ্য (মিড্‌ল) অথবা নিম্ন-মাধ্যমিক (জুনিয়র সেকেণ্ডারী) বা উচ্চ বুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক) স্তরের জন্যে নির্দিষ্ট আর বাকী ৪ বছরে দেওয়া হবে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা (হাইয়ার সেকেণ্ডারী ষ্টেজ্)।

একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন। কমিশনের সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১১ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত নির্ধারিত হওয়ায় অনেকের মনে ধারণা হতে পারে যে সরকার অনুমোদিত ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত নিদিষ্ট বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে নবপরিকল্পিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। কারণ জাকির হোসেন কমিটির এবং পরবর্তী কালের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির বিবরণীগুলিতে বর্ণিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার পর মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষার কিয়দংশও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উচ্চবুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের উপযোগী বয়সকালের মধ্যেই পড়ে। তা সত্ত্বেও উচ্চবুনিয়াদী স্তরের সঙ্গে যাতে কোন সংঘর্ষ না বাধে সেজন্যে কমিশন উচ্চবুনিয়াদী, মধ্য ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সাধারণ বিধিব্যবস্থা ও পাঠ্যতালিকার মধ্যে সমতা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়াও, প্রাথমিক বা নিম্ন-বুনিয়াদী, মধ্য বা উচ্চবুনিয়াদী এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যতালিকাও সুসম্বদ্ধ ও ধারাবাহিক হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ

করে প্রথম ৮ বছরের শিক্ষাকে (নিম্নবুনিয়াদী ও উচ্চবুনিয়াদী শিক্ষা) একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত করতে পারলে তবেই ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত একটি সুসংগত, আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব।

মাধ্যমিক শিক্ষাকাল এক বছর বর্দ্ধিত করার প্রস্তাবে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। এই অতিরিক্ত এক বছরের শিক্ষাব্যবস্থা কি ভাবে করা যায়? অধিকাংশ দশম শ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয়গুলির পক্ষে অতিরিক্ত এক বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। দেশের হাজার হাজার উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে যথাযোগ্য সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে এগার শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করতে সময় যেমন লাগবে প্রচুর তেমনি অর্থেরও প্রয়োজন যথেষ্ট। তাই কমিশন পরামর্শ দিলেন কিছু দিনের জন্যে প্রচলিত দশমশ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয় ও এগারশ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, (যেগুলি এখনই এক বছরের অতিরিক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সক্ষম), এই উভয়বিধ বিদ্যালয়েই ব্যবস্থা থাকবে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্যে। দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে যথোপযুক্ত সাজসরঞ্জাম এবং উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে ক্রমশঃ এগারশ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে। আর যেসব বিদ্যালয় এখনই অতিরিক্ত এক বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সক্ষম সেগুলিকেও অনুমোদন দেবার আগে দেখতে হবে এগারশ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নত হবার মত স্থান, সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী ও তাঁদের বেতন ও পদোন্নতির উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং এরূপ বিদ্যালয়গুলি বরাবর কার্যকরী রাখার মত আর্থিক সামর্থ্য আছে কিনা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশনের সুপারিশের মত মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনও প্রচলিত দু'বছরের ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দিয়ে এর এক বছর মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্যে পরামর্শ দিলেন। সেই সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের অন্য বছরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকোর্সের সঙ্গে যুক্ত করে ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রীকোর্স চালু করতেও বল্লেন।

প্রচলিত ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজগুলি সম্বন্ধে কমিশনের নির্দেশ হল, যেখানে একই কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজ ও হাইস্কুল দুইই আছে সেখানে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের সিনিয়র ক্লাশটি উঠিয়ে দিয়ে এবং জুনিয়র ক্লাশটি হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করার কোন অসুবিধাই নেই। আর যে সকল কলেজে উপযুক্ত স্থান ও সাজসরঞ্জাম আছে, উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী ও প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে সেগুলিকে ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কলেজে পরিণত করা যেতে পারে। প্রচলিত ব্যবস্থায় ডিগ্রী কলেজও দু'রকমের আছে। কোনো কোনো প্রদেশে দু'বছরের ডিগ্রী কলেজ আছে, কোথাও আবার চার বছরের কলেজে দু'বছর ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের এবং অপর দু'বছর ডিগ্রীকোর্সের শিক্ষা দেওয়া হয়। দু'বছরের কলেজগুলিতে অতিরিক্ত এক বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কলেজে পরিণত করা সম্ভব। চার বছরের ডিগ্রী কলেজগুলি সম্বন্ধে কমিশন বল্লেন এই কলেজগুলির প্রথম বছরে প্রি-ইউনিভারসিটি কোর্সের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে বাকী তিন বছরে ডিগ্রীকোর্সের শিক্ষা দেওয়াই সমীচীন। যারা দশম শ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হবে তাদের

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষালাভের অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক বছরের প্রি-ইউনিভারসিটি কোর্সের প্রবর্তন করার পরামর্শ কমিশন তাঁদের সুপারিশে দিয়েছেন। এই কোর্সে তিনটি বিষয় শিক্ষাদানের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে, প্রথমতঃ, যতদিন ইংরেজী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মাধ্যম থাকবে ততদিন শিক্ষার্থীদের এই ভাষা ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে, দ্বিতীয়তঃ, উচ্চশিক্ষাগ্রহণের পক্ষে অপরিহার্য আত্মচেষ্টায় বা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পড়াশোনা করার অভ্যাস তাদের আয়ত্ত করানো, তৃতীয়তঃ, সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং এই পরিস্থিতি ও সমাজব্যবস্থার ওপর আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীকে সাধারণ জ্ঞানদান। কমিশনের মতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে যে অসংলগ্ন ব্যবধান বর্তমান তা দূর করতে হলে প্রি-ইউনিভারসিটি কোর্সের শিক্ষা সুচিন্তিত এবং সযত্নে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (প্রোফেশান্যাল কলেজ) সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে, পূর্তাদিকার্যবিষয়ক বিদ্যা (এন্‌জিনীয়ারিং), চিকিৎসাশাস্ত্র (মেডিসিন), কৃষিবিদ্যা (এগ্রিকালচার), পশুচিকিৎসা (ভেটেরিন্যারী) প্রভৃতি বৃত্তিমূলক বিষয়ের শিক্ষাগ্রহণের পূর্বে শিক্ষার্থীদের ঐ সকল বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে দেবার উদ্দেশ্যে এক বছরের প্রি-প্রোফেশান্যাল কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে এবং যাদের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয়েছে ও যারা উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এক বছরের প্রি-ইউনিভারসিটির শিক্ষাও সমাপ্ত করেছে তাদেরই এই প্রি-প্রোফেশান্যাল কোর্স গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। সম্ভব হলে প্রোফেশান্যাল কলেজেই প্রি-প্রোফেশান্যাল কোর্সের প্রবর্তন করা উচিত অন্যথায় যে সকল

ডিগ্রী কলেজে উপযুক্ত সুযোগসুবিধা আছে সেগুলিতে সাময়িকভাবে প্রি-প্রোফেশান্যাল কোর্সের শিক্ষদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতীয় সংবিধানের ব্যবস্থামত ১৪ বছর পর্যন্ত আবশ্যিক এবং অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন হলে বিভিন্নরুচি, মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করতে আসবে। কমিশনের মতে এই সকল বিভিন্নরুচি, মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দাবী মেটাতে হলে প্রয়োজন মালটিল্যাটারাল্ অথবা মালটিপারপাস্ তথা বহুমুখী বা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপন করে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষি, কারিগরি, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সকল মালটিপারপাস্ তথা বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে যারা যন্ত্র ও শিল্প সম্বন্ধীয় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চাইবে তাদের জন্যে পলিটেক্নিক্স অথবা টেক্নোলজিক্যাল ইনস্টিট্যুট স্থাপন করে দুই বা ততোধিক বছর শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কমিশন মনে করেন। প্রাদেশিক সরকার কতৃক কিংবা অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্নিক্যাল এডুকেশন কতৃক এদের সার্টিফিকেট অথবা ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থাও করতে হবে।

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে শতকরা পঁচাত্তর জনেরও বেশী লোক কৃষিকাজ করে জীবিকার্জন করে থাকে, আর গ্রামাঞ্চলে ত কৃষিকাজই প্রধান উপজীবিকা বলা যায়। তাই কমিশন নির্দেশ দিলেন প্রত্যেক প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষিবিদ্যার সঙ্গে উদ্যানকর্ষণ বিদ্যা (হর্টিকালচার), পশুপালন এবং কুটিরশিল্প সম্বন্ধীয়ও শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা থাকবে। শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত—শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও হাতেকলমে

কাজ করার শক্তি ও দক্ষতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা যার সাহায্যে সে তার সমাজ ও সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করতে পারে। আর দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলতে হলে এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্তের শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে প্রয়োজন দেশের শিল্পকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা।

বহুদিন পূর্বে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, হাণ্টার কমিশন এদেশের একমুখী শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রুচি, প্রবণতা ও মেধা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করে জ্ঞানমুখী শিক্ষার মতই তাদের শিল্পশিক্ষা বা কারিগরিবিদ্যার্জনের সুযোগদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কতকগুলি কারণবশতঃ ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দেশের শিল্পশিক্ষার প্রসার বা উন্নতি কিছুই হয় নি বলা যায়। তাই মাধ্যমিক কমিশন তাঁদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করে কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ দিলেন।

কমিশনের মতে দেশে বহুসংখ্যক শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিশেষ চার ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্যে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (১) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের চারটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্যে টেকনিক্যাল হাইস্কুল বা মালটিপারপাস্ স্কুল স্থাপন করতে হবে। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পার্থক্য হচ্ছে এখানে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষনীয় বিষয় ছাড়াও (১) অ্যাপ্লায়েড্ ম্যাথেম্যাটিক্স্ এবং জিওমেট্রিক্যাল ড্রয়িং (২) এলিমেণ্টস্ অফ ওয়ার্কসপ টেক্নোলজি, (৩) এলিমেণ্টস্ অফ মেক্যানিক্যাল এ্যাণ্ড ইলেকট্রিক্যাল এন্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। (২) যারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার অযোগ্য কিংবা আর্থিক কারণবশতঃ যারা পড়াশোনা

ছেড়ে দিয়ে যত শিগ্‌গীর সম্ভব অর্থোপার্জন করতে বাধ্য হয় তাদের জীবিকাগত শিল্পশিক্ষা দানের জন্যে স্কুল অফ ইনডাস্‌ট্রি অথবা ট্রেড স্কুল স্থাপন করে মেক্যানিক্যাল এন্‌জিনীয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিক্যাল এন্‌জিনীয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখানে সাধারণতঃ দু'বছর শিক্ষাদানের এবং শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। (৩) যারা মাধ্যমিক শিক্ষাসমাপ্তির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ অপেক্ষা শিল্পসম্বন্ধীয় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায় তাদের জন্যে থাকবে টেক্‌নিক্যাল ইনস্‌টিট্যুট এবং এন্‌জিনীয়ারিং কলেজের ব্যবস্থা, যেখানে তারা তিন বছর শিক্ষালাভ করবে এবং শিক্ষান্তে ডিপ্লোমা পাবে। (৪) আর উপরোক্ত চার শ্রেণীর মধ্যে যারা শিক্ষা শেষ করে কোন কর্মে নিযুক্ত হবার পরও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় অবসর সময়ে সান্ধ্যক্লাশে যোগ দিয়ে নিজ নিজ পছন্দমত বিষয়ের অনুশীলন করতে আগ্রহী তাদের জন্যে সেইমত ব্যবস্থা করে অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষার সুযোগও দিতে হবে।

এছাড়া, বড় বড় সহরে সেণ্ট্রাল টেক্‌নিক্যাল ইনস্‌টিট্যুট স্থাপন করে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে শিল্পশিক্ষাসম্বন্ধীয় সহায়তা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানেই সম্ভব ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নিকটে অনুরূপ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে এই শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়গুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় কাজ করতে সক্ষম হয়। শিল্পশিক্ষায় অ্যাপ্রেন্টিস্‌শিপ বা শিক্ষানবীশির বিশেষ প্রয়োজন, তাই উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে বাধ্যতামূলক করতে হবে। দেশের শ্রমশিল্পের ওপর ইনডাস্‌ট্রিয়াল এডুকেশন সেস্‌ নামক কর ধার্য করা প্রয়োজন এবং সংগৃহীত

অর্থ শিল্পশিক্ষার উন্নতি বিধানে ব্যয় করা হবে। সকল স্তরের টেক্‌নিক্যাল এবং টেক্‌নোলজিক্যাল শিক্ষার পরিকল্পনায় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিরা সর্বদা শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে সংযোগ রাখবেন। আর মাধ্যমিক স্তরে শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ আদর্শের মধ্যে সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে শিল্পশিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারণে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা গ্রহণ বিশেষ কর্তব্য।

মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন তাদের বিবরণীতে উচ্চবিদ্যালয়, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়াও পাব্‌লিক স্কুল, রেসিডেনশ্যাল স্কুল, রেসিডেনশ্যাল ডে স্কুল এবং অন্ধ, মূক ও বধির প্রভৃতিদের শিক্ষাদানের বিদ্যালয়গুলির (এগুলিতে ১১ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়) সম্বন্ধে এবং স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ও আলোচনা করেছেন।

ভারতের পাব্‌লিক স্কুলগুলি ইংলণ্ডের পাব্‌লিক স্কুলের আদর্শে গঠিত বলা যায়। তাই স্বাধীনভারতে এরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কিনা এ নিয়ে মত বিরোধের অন্ত নেই। কেউ কেউ মনে করেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই কারণ এগুলিতে সংকীর্ণমনা ও চালবাজ কতকগুলি নাগরিকের সৃষ্টি হয় মাত্র যারা গণতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের স্থান করে নিতে অক্ষম। আবার অপর দলের মতে পাব্‌লিক স্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি, অপরের প্রতি সহানুভূতির অভাব এবং অবিনীত আচার-ব্যবহার সত্ত্বেও যথার্থ জনসেবক বা পাব্‌লিক সারভেণ্ট হবার গুণও, যেমন, নিয়মকানুন মেনে চলা, কোন কিছু গড়ে তোলার এবং দায়িত্বগ্রহণের তৎপরতা প্রভৃতিও এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। অতএব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পাব্‌লিক স্কুলেরও প্রয়োজন আছে।

প্রতিকূল এবং অনুকূল যুক্তিগুলির যথাযথ বিচার করে কমিশন স্থির করলেন এগুলিকে ঠিকভাবে পরিচালিত করে জাতীয় শিক্ষার আদর্শে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে দেশের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার পক্ষে সত্যি এগুলি সহায়ক হবে। তবে যেহেতু এই বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা করতে যায় সেজন্যে এগুলিতে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক সাহায্যদানের বিশেষ প্রয়োজন নেই। বর্তমানে যে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা আছে ক্রমশঃ তার পরিমাণ হ্রাস করে এগুলিকে স্বাবলম্বী করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারেরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ফ্রি স্টুডেন্টশিপের ব্যবস্থা অবশ্য করতে পারেন।

কমিশনের মতে গ্রামাঞ্চলে রেসিডেনশ্যাল স্কুল বা আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন। আর যাঁদের কর্মোপলক্ষে প্রায় স্থান বদল করতে হয় সেইসব সরকারী কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্যেও কতকগুলি আবাসিক বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক। এধরণের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকার সামাজিক আচারব্যবহারের, সমাজসেবা প্রভৃতির শিক্ষালাভও হয়। সন্নিকটে শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষার্থীরা গৃহ পরিবেশ ও গৃহের প্রভাব থেকেও বঞ্চিত হবে না।

রেসিডেনশ্যাল ডে স্কুলে শিক্ষার্থীরা সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত থাকার সুযোগ পায়, তাই বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, প্রভৃতি তারা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শলাভ এবং পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের ও সুপারভাইজড্ স্টাডির সুযোগ এখানে অনেক বেশী, তাই কমিশন

অধিক সংখ্যায় এধরণের বিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রয়োজন আছে মনে করেন। এছাড়া, অন্ধ, মূক ও বধিরদের জন্যেও যত বেশী বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা যায় ততই দেশের মঙ্গল। এই বিদ্যালয়গুলিও কমিশনের মতে আবাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষার্থীরা উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত এখানে যাতে থাকতে পারে সেরূপ ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন বল্লেন বর্তমানযুগে মেয়েদের জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে বালিকা-বিদ্যালয়ে এবং যেখানে সহশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে সেসব প্রতিষ্ঠানে বালিকাদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, হোম ক্রাফট্, মিউজিক, ড্রয়িং প্রভৃতি শিক্ষাদেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে যেখানে সহশিক্ষা দেওয়া হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকা নিয়োগ করা, ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের জন্যে স্বতন্ত্র বিশ্রামকক্ষ, খেলার মাঠ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাও দরকার। আর যেখানে স্বতন্ত্র বালিকাবিদ্যালয়ের চাহিদা বেশী সেখানে প্রাদেশিক সরকারেরা এরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যেও সচেষ্ট হবেন।

ভাষা শিক্ষা।

শিক্ষাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের সময় বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত আলোচনা-কালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষার শিক্ষাদান সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন কমিশনের নিকট উত্থাপিত হয়েছিল। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতগুলি ভাষা বিদ্যার্থীদের পক্ষে শিক্ষা করা সম্ভব এবং কোন্ কোন্ স্তরে ভাষা শিক্ষা শুরু করা কর্তব্য? স্বাধীন-ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য পূর্ববৎ থাকার প্রয়োজন আছে কিনা এবং হিন্দীভাষা শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া উচিত কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করা হয়েছিল।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি এবং ঐগুলির পরস্পরবিরোধী উত্তর যথাযথ

বিচার করে কমিশন নব পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষার শিক্ষাদান সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দেশ দিলেন। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরেই মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের (যাদের মাতৃভাষা এবং আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা এক নয়) জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির নির্দেশমত বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ন্যূনতম চল্লিশটি ছাত্রছাত্রী থাকলেই অন্ততঃ একজন শিক্ষক নিয়োগ করেও সকল শ্রেণীতে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে আর উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকলে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতগুলি ভাষা শিক্ষাদান কর্তব্য এবং কোন্ কোন্ স্তরে ভাষা শিক্ষা শুরু করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে বিদেশে ভাষা শিক্ষাব্যবস্থার নজির দেখিয়ে কমিশন মন্তব্য করলেন যে শিশুদের পক্ষে এক সঙ্গে তিনটি ভাষা শিক্ষা করা এমন কিছু কঠিন নয়, বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন প্রকার অক্ষর শেখার ফলে পরিশ্রম হয়ত কিছু বেশী হবে, তবু পরবর্তীকালের চেয়ে শিশুবয়সেই এগুলি আয়ত্ত করা অনেক বেশী সহজ। সেজন্যে সিনিয়র বেসিক অথবা মধ্যবিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ও হিন্দী দুটি ভাষার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, ইতিমধ্যে মাতৃভাষা তাদের কিছুটা আয়ত্ত হয়ে যাবে। তবে দুটি ভাষাই একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া চলবে না, প্রথম বছরে একটি শিক্ষা দিয়ে অপরটি পরের বছরে শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার্থীদের দুটি ভাষা শিখতে হবে, তার মধ্যে একটি হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা আর অপরটি শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রয়োজনমত নির্বাচন করে নেবে।

হিন্দীভাষা শিক্ষাসম্বন্ধে কমিশন বল্লেন কেন্দ্রে এবং কতকগুলি

প্রদেশে হিন্দীভাষা সরকারীভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে অতএব মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীরই এই ভাষার প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন, সেজন্যে মধ্যবিদ্যালয় বা সিনিয়র বেসিক স্তরে হিন্দীভাষাও শিক্ষা দিতে হবে। হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে ক্রমশঃ এই ভাষা শিক্ষার মান উন্নত করা প্রয়োজন সন্দেহ নেই কিন্তু অহিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে ভাষাটি যাতে শিক্ষার্থীরা মোটামুটি শিখে নিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে সেইমত শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত হল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং মধ্যবিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে এই ভাষা শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ না করে যারা সিনিয়র বেসিক বা মধ্যবিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা শেষ করবে পাঠক্রমে তাদের এইভাষার প্রাথমিক জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যারা উচ্চশিক্ষালাভ করতে চায় তাদের জন্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার উচ্চতর শিক্ষার বা অ্যাডভান্সড্ কোর্সের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বহুমুখী শিক্ষাসূচীর কতকগুলি বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষার পক্ষে এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ের শিক্ষালাভের জন্যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রয়োজন যতদিন না দেশীয় ভাষায় ঐ সকল বিষয়ের উপযুক্ত পুস্তক রচিত হচ্ছে।

এছাড়া, কমিশনের মতে উচ্চবিদ্যালয়ে অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যাতে ইচ্ছে করলে শিক্ষার্থীরা এগুলিরও অনুশীলন করতে পারে।

উপসংহারে কমিশন বলেছেন ভালভাবে ভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং বিদ্যার্থীদের পক্ষে সেই ভাষা সহজে আয়ত্ত করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে

উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী এবং উত্তম সাহিত্যের ওপর। সেই সঙ্গে ভাষাশিক্ষাদানের প্রণালীরও পরিবর্তন আবশ্যক। ইংরেজী, হিন্দী, মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা, যে কোনো ভাষাই হোক ভালভাবে সাধারণ গদ্য পাঠে সক্ষম হবার আগেই শিক্ষার্থীকে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করালে ভাষার প্রতি তার বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয় মাত্র। উপযুক্ত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষকদের ভাষাশিক্ষাদান প্রণালীর ট্রেনিং দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার উপযোগী গদ্যে এবং পদ্যে উন্নত ধরণের পুস্তক রচনায় যোগ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকা বহুদিন থেকেই সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের কাছেও অনেকে এ নিয়ে বহু আলোচনা ও সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে এই পাঠক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ, পুঁথিগত এবং তত্ত্বমূলক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনের উপযোগী ক্রিয়াকলাপের কোনো ব্যবস্থাই এতে নেই উপরন্তু সুগভীর ভাব ও তাৎপর্যহীন কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টি মাত্র করে তোলা হয়েছে পাঠক্রমকে। বিভিন্নরুচি, যোগ্যতা ও মেধা সম্পন্ন নবযৌবনোন্মুখ ছাত্রছাত্রীর বিভিন্নপ্রকার প্রয়োজনের উপযোগী বৈচিত্র্য নেই আদৌ, শুধুমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুমতি লাভ করাই এরূপ পাঠক্রমের লক্ষ্য। সেজন্যে জীবিকাগত কোনো ব্যবহারিক বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এতে নেই। সংক্ষেপে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার মতই এর পাঠক্রমেরও জীবনের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই। ব্যবহারিক জীবনের কোনো প্রস্তুতি এই শিক্ষালাভের দ্বারা হয় না। কমিশন এই সমালোচনার যাথার্থ্য স্বীকার করে নবপরিকল্পিত

শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি নির্দেশ দিলেন। তাঁদের মতে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য, আর এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি নীতি অনুসরণ করাও প্রয়োজন। প্রথমে মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত, শ্রেণীতে, গ্রন্থাগারে, গবেষণাগারে, শিক্ষকদের সাহচর্যে লব্ধ অভিজ্ঞতা তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে সুষম ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন করতে সক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত রুচি, প্রয়োজন, যোগ্যতা ও মেধার বিভিন্নতার কথা চিন্তা করে পাঠক্রমকে যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ ও স্থিতিস্থাপক করে তুলতে হবে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অপরিহার্য সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন, তাহলে শিক্ষকেরা সহজে শিক্ষার্থীদের মনে তারা যে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এ ধারণার সৃষ্টি করতে পারবেন আর সমাজও তাহলে বিদ্যালয়কে সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করতে পারবে। চতুর্থতঃ, বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ধারণে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও কর্মে দক্ষতা অর্জনের বিষয় চিন্তা করাই যথেষ্ট নয় সেইসঙ্গে তারা যাতে রুচিসঙ্গতভাবে অবসর বিনোদনের শিক্ষারও সুযোগ পায় সেইভাবে পাঠক্রম নির্ণয় করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে খেলাধূলো, সামাজিকতা, চারুশিল্প, ললিতকলা প্রভৃতির অনুশীলনের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ, পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত করতে হবে।

উপরোক্ত নীতিগুলি অনুসরণ করে কমিশন বল্লেন যেহেতু মধ্য-বিদ্যালয় বা সিনিয়র বেসিক স্তর প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক স্তরের সম্প্রসারণ অতএব এই দুই স্তরের পাঠক্রম ও শিক্ষাদানপ্রণালীর মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। প্রাথমিক স্তরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত, অতএব মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকায় কর্মের

ওপরই বিশেষ জোর দিতে হবে, তাহলে এই উভয়বিধ শিক্ষাস্তরের ধারাবাহিকতাও বজায় থাকবে। আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য মধ্যবিত্যালয়স্তরের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয় সুপণ্ডিত করা নয়, শুধুমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সাধারণ জ্ঞানদানই এই স্তরের উদ্দেশ্য। অতএব মধ্যবিত্যালয় স্তরের পাঠক্রমে ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, সঙ্গীত ও চারুশিল্প, শিল্পবিত্যা (ক্র্যাফট্) এবং শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা, এই সাতটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট। এই স্তরে ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত হল শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিখতে হবে, সেই সঙ্গে সরকারী ভাষা হিন্দীও শেখা প্রয়োজন, আর যাদের মাতৃভাষা হিন্দী তারা এর পরিবর্তে অন্য একটি ভাষাও শিখতে পারে। এ ছাড়া, প্রত্যেক বিত্যালয়ে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তবে শিক্ষার্থীদের অথবা অভিভাবকদের আপত্তি থাকলে ইংরেজী ভাষা আবশ্যিক করা যাবে না। যে সকল ছাত্রছাত্রী ইংরেজী শিখতে চাইবে না তাদের অন্য একটি বিকল্প ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ইংরেজী ভাষা ঐচ্ছিক বিষয়রূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যে সকল বিত্যালয়ে থাকবে সেখানে যারা ঐচ্ছিক বিষয়রূপে ইংরেজী শিখবে না তাদের জন্যে মাতৃভাষার উচ্চতর পাঠ্যসূচীর (অ্যাডভান্সড্ কোর্স) বিকল্প ব্যবস্থাও থাকবে। এই স্তরে মাতৃভাষা কতকটা আয়ত্ত হলে অন্য দুটি ভাষার শিক্ষাদান শুরু হবে। এ দুটি ভাষাও আবার একই সঙ্গে না শিখিয়ে একটি শেখাবার এক বছর পর অন্যটি শেখাতে হবে। আর এই ভাষা দুটির সাহিত্যিক বিষয় আলোচনা না করে শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনে যতটুকু দরকার সেইমত শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিল্প শিক্ষাদান সম্বন্ধে কমিশনের নির্দেশ হল এই স্তরে স্থানীয় কোন শিল্প স্থানীয় উপকরণাদির সাহায্যে শিক্ষা দিতে হবে।

উচ্চবিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ হল, এই স্তরের ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত রুচি, সামর্থ্য, মেধা ও প্রয়োজনের বিভিন্নতার বিষয় চিন্তা করে পাঠক্রমকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে হবে যাতে যোগ্যতা, মেধা ও রুচি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানবিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা ইত্যাদির বিভিন্ন ধারায় পঠন-পাঠনের সুয়োগ পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসমাপ্তির পর অধিকাংশ বিদ্যার্থীরই উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে না, উপরন্তু তাদের অর্থোপার্জনের জন্যে তৈরী হতে হয়। তাই এই স্তরে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক কোন কর্মের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আর উচ্চবিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম একই আদর্শে রচিত হবে, পাঠক্রমে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্যে থাকবে কতকগুলি 'কোর সাব্‌জেক্ট' এবং কতকগুলি 'অপ্‌শন্যাল সাব্‌জেক্ট' বা ঐচ্ছিক বিষয়। উভয়বিধ বিষয়গুলি পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত করে শিক্ষা দিতে হবে। অতএব কমিশন নির্দেশ দিলেন উচ্চবিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে থাকবে, (অ) (১) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিকভাষা অথবা মাতৃভাষা এবং একটি ক্লাসিক্যালভাষার সংযুক্ত পাঠ্যসূচী, (২) আরো একটি ভাষা নিম্নোক্ত ছয়টি ভাষার মধ্যে থেকে নির্বাচন করে শিক্ষার্থীরা শিখবে, যথা, (ক) হিন্দী (যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তাদের জন্যে), (খ) প্রাথমিক ইংরেজী (যারা মধ্যবিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে নি তাদের জন্যে), (গ) অ্যাডভান্সড্ বা উচ্চতর ইংরেজী (যারা পূর্ববর্তীস্তরে ইংরেজী শিখেছে তাদের জন্যে,) (ঘ) হিন্দী ছাড়া একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা, (ঙ) ইংরেজী ছাড়া একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা এবং (চ) একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা।

(আ) (১) 'সোশ্যাল স্টাডিজ' এর সাধারণ পাঠ্যসূচী প্রথম ছ'বছর পড়ানো হবে মাত্র।

(২) গণিতশাস্ত্রসহ সাধারণ বিজ্ঞানের ও সাধারণ পাঠ্যসূচী প্রথম দু'বছর পড়ানো হবে।

(ই) নিম্নোক্ত নয়টি শিল্পবিদ্যা থেকে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ রুচিমত একটি নির্বাচন করে শিক্ষালাভ করবে, (স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে শিল্পবিদ্যার সংখ্যা আরও বাড়ানো যেতে পারে)—(ক) তাঁত শিল্প, (খ) কাঠের কাজ, (গ) ধাতুর কাজ, (ঘ) উদ্যান-নির্মাণ কৌশল, (ঙ) দর্জির কাজ (চ) মুদ্রাঙ্কন বিদ্যা, (ছ) কলকারখানার কাজ (জ) সীবন ও সূচীকর্ম এবং (ঝ) মডেলিং বা নক্সার কাজ।

(ঈ) নিম্নোক্ত সাতটি বিভাগের—(ক) হিউম্যানিটিস বা মানবীয় বিষয়, (খ) বিজ্ঞানাদি, (গ) যন্ত্রশিল্প, (ঘ) বাণিজ্য সম্বন্ধীয়, (ঙ) কৃষি সম্বন্ধীয়, (চ) ললিত কলা ও (ছ) গৃহ বিজ্ঞান,—যে কোন একটি বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীরা তিনটি বিষয় নির্বাচন করে শিক্ষালাভ করবে, যথা—(ক) হিউম্যানিটিস বা মানবীয় বিষয় সম্বন্ধীয়—

(১) একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা অথবা 'অ' বিভাগের ২নং ধারা থেকে পূর্বে লওয়া হয় নি এমন একটি ভাষা তৃতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করতে হবে, (২) ইতিহাস, (৩) ভূগোল, (৪) অর্থবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান, (৫) মনস্তত্ত্ব ও. তর্কশাস্ত্র, (৬) গণিত শাস্ত্র, (৭) সঙ্গীত এবং (৮) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

(খ) বিজ্ঞানাদি—(১) পদার্থবিদ্যা, (২) রসায়ন বিদ্যা, (৩) জীববিদ্যা, (৪) ভূগোল বিদ্যা, (৫) গণিত শাস্ত্র, (৬) শারীর বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান (অবশ্য জীববিদ্যার সঙ্গে লওয়া যাবে না)।

(গ) যন্ত্র শিল্প—(১) অ্যাপ্লায়েড্ ম্যাথেম্যাটিক্স্ ও জিওমেট্রিক্যাল ড্রয়িং, (২) অ্যাপ্লায়েড্ সায়েন্স, (৩) মেকানিক্যাল এন্‌জিনীয়ারিং ও (৪) ইলেক্‌ট্রিক্যাল এন্‌জিনীয়ারিংএর প্রাথমিক জ্ঞান।

(ঘ) বাণিজ্য বিষয়ক—(১) কমার্স্যাল প্র্যাক্‌টিস, (২) বুককিপিং, (৩) কমার্স্যাল জিওগ্রাফি অথবা অর্থবিজ্ঞান এবং পৌরবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা, এবং (৪) শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং।

(ঙ) কৃষিবিদ্যা—(১) সাধারণ কৃষিবিদ্যা, (২) পশুপালন সম্বন্ধীয় বিদ্যা, (৩) উদ্যান-নির্মাণ ও উদ্যানকর্ষণ বিদ্যা, এবং (৪) এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট্রি ও উদ্ভিদ বিদ্যা।

(চ) ললিত কলা—(১) চারুশিল্পের ইতিহাস, (২) অঙ্কন ও নক্সাকরণ, (৩) চিত্রবিদ্যা, (৪) মডেলিং, (৫) সঙ্গীত ও (৬) নৃত্য।

(ছ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান—(১) গার্হস্থ্য অর্থনীতি, (২) পুষ্টিকর খাদ্য-ব্যবস্থা ও পাক প্রণালী, (৩) জননী সুলভ সেবা নৈপুণ্য (মাদার ক্রাফট্) ও শিশু-তত্ত্বাবধান, ও (৪) পরিবারিক সুব্যবস্থা ও শুশ্রূষা।

এ ছাড়াও শিক্ষার্থী উপরোক্ত যে কোন বিভাগ থেকে একটি অতিরিক্ত বিষয় নিজের পছন্দমত গ্রহণ করতে পারে। এই পাঠক্রম সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য। পৃথগ্‌ভূত পাঠক্রম অনুসরণ করে শিক্ষা শুরু হবে উচ্চবিদ্যালয়ের এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বছর থেকে, অবশ্য নির্বাচিত শিল্পবিদ্যাটি প্রথম বছর থেকেই শিখতে হবে। এই স্তরে মাতৃভাষা ছাড়াও শিক্ষার্থীর পছন্দমত ইংরেজী বা হিন্দী কিংবা অন্য একটি ভাষা শিখতে হবে। যাদের ভাষাশিক্ষার বিশেষ ক্ষমতা থাকবে তারা অতিরিক্ত একটি ভাষা তৃতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করতে পারবে।

মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং মাতৃভাষা শিক্ষাদানের জন্যে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

অপর ভাষাগুলি (ইংরেজী বা ক্লাসিক্যাল অথবা কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা) দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপযোগী করে শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যাতে এসকল

ভাষার পুস্তকাদি পড়ে ভালভাবে বুঝতে পারে, সেই সঙ্গে কথাবার্তায় নির্ভুলভাবে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, আর সহজ ও সাধারণ বিষয় শুদ্ধভাবে লিখতে পারে।

ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলির সমন্বয়ে আধুনিককালে "সোশ্যাল স্টাডিজ" বা সামাজিক পারিপার্শ্বিকের শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে, শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশের উপযোগী করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলি সমন্বিতভাবে (as a compact whole) পড়ানো আবশ্যক। তার ফলে শিক্ষার্থীরা সামজিক পরিবেশের উপযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের শিক্ষালাভ করবে, যেমন, সমাজ কিভাবে গড়ে উঠ্‌লো, পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতির সৃষ্টি করে ও কি প্রকারে হয়েছে এবং এগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করবে।

পাঠক্রমের নির্দেশদানের পর বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেও কমিশন তাঁদের মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। কমিশনের মতে উন্নত ধরণের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব শিক্ষাদপ্তরের এবং কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক অন্ততঃ 'টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির' প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে একটি 'হাই পাওয়ার কমিটি' গঠন করতে হবে সাতজন উচ্চপদস্থ, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে, যেমন, (১) রাষ্ট্রের বিচারক সম্প্রদায়ের উচ্চপদস্থ একজন, হাইকোর্টের জজ্‌ হলেই ভাল, (২) সংশ্লিষ্ট প্রদেশের পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের একজন সদস্য, (৩) সংশ্লিষ্ট প্রদেশের একজন ভাইস্‌চ্যান্সেলার, (৪) একজন প্রধান শিক্ষক অথবা প্রধান শিক্ষিকা, (৫ এবং ৬) কমিটির অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত দু'জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ (৭) শিক্ষা অধিকর্তা।

শিক্ষা অধিকর্তা কমিটির সেক্রেটারী হবেন। কমিটি সভাপতি নির্বাচনও করতে পারেন আর কমিটির সদস্যতা পাঁচ বছরের জন্যে নির্ধারিত হবে। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সরকার সদস্যদের মনোনীত করতে পারে। কমিটির স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা থাকবে।

কমিটির কাজ হবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সকল পুস্তক সমালোচনার জন্যে অভিজ্ঞ সমালোচকদের তালিকা ঠিক করে রাখা এবং পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ে পাঠ্য অন্যান্য পুস্তক রচনার জন্যে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো। এ সকল পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থাও কমিটি করবেন এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থের একটি 'ফাণ্ড' থেকে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া, পুস্তকের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দুগ্ধ বিতরণ, মধ্যাহ্নকালীন আহার ও সান্ধ্যকালীন জলযোগের জন্যে অর্থ সাহায্য করা প্রভৃতির ব্যবস্থাও কমিটি করবেন। এ ছাড়া, যে সকল গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলে গৃহীত হবে তাঁদের উপযুক্ত দক্ষিণা ও প্রাপ্যাংশ দেবার ব্যবস্থা করা কমিটিরই কর্তব্য। কমিটির নিজস্ব দপ্তর থাকবে, এই দপ্তরের ব্যয়ও নির্বাহ হবে পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থের 'ফাণ্ড' থেকে।

পাঠ্যপুস্তকের কাগজ, মুদ্রণ, আকার এবং উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত ছবি ইত্যাদিও উন্নত ধরণের হওয়া আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সম্ভব হলে প্রাদেশিক সরকারেরা ভাল ভাল উদাহরণের 'ব্লকের' সংগ্রহশালা স্থাপন করে পুস্তকে প্রদত্ত উদাহরণের ছবি ইত্যাদির মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'টেক্সট বুক কমিটি' ও প্রকাশকদের কাছে 'ব্লক' সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

বিদ্যালয়ে প্রায়শঃ পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের নীতি কমিশন সমর্থন করেন নি।

সুচিন্তিত এবং পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকার সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষাদান প্রণালীর এবং যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর যাঁরা বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুরাগ, প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে সেইভাবে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাদান প্রণালীকে প্রাণবন্ত করতে সক্ষম। এরূপ শিক্ষকমণ্ডলী একান্ত নীরস ও অমনোমত পাঠ্যবিষয়ও পড়ানোর গুণে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

প্রাণবন্ত শিক্ষাদান প্রণালী।

প্রচলিত শিক্ষাদান প্রণালীর দোষত্রুটিগুলির আলোচনা করে আদর্শ শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের নির্দেশ এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হল। প্রচলিত শিক্ষাদান প্রণালীর প্রধান দোষ ইহা বাকসর্বস্ব, শিক্ষণীয় বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে ও টীকা লিখিয়ে দিয়ে শিক্ষক তাঁর কর্তব্য শেষ করেন আর শিক্ষার্থী নিশ্চেষ্টভাবে শিক্ষকের বর্ণনা শুনে যায় এবং কোনোরকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আশায় টীকাগুলি লিখে নিয়ে বাড়ীতে মুখস্থ করে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন কাজ করার সুযোগ শিক্ষার্থী পায় না, তাই জ্ঞানলাভের আকাজ্ক্ষা কিংবা নিপুণভাবে কাজ করার অভ্যাস তার হয় না।

বস্তুতঃ শিক্ষকের কাজ প্রধানতঃ দুটি, প্রথমতঃ, তাঁকে শিক্ষার্থীদের মনে কর্মের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ, সকল কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করার মত দায়িত্ববোধ তাদের জাগাতে হবে। লেখাপড়া, অঙ্কন, রচনা, নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সকল কাজই যেন তারা আগ্রহের সঙ্গে ভালভাবে সম্পন্ন করে প্রথম থেকেই তাদের সেইভাবে শিক্ষা দিতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন অভ্যাসের। কোনো সদ্‌গুণই অভ্যাস ব্যতীত আয়ত্ত

হতে পারে না। যেমন নিয়মানুবর্তিতা অথবা সহযোগিতার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে কিংবা বই পড়িয়ে শিক্ষার্থীদের এ গুণদুটির অধিকারী করে তোলা যায় না, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার সুযোগ পেলে তবেই গুণদুটি তাদের আয়ত্ত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষা করা প্রধানতঃ শিক্ষার্থীরই কাজ এবং তাহা অভ্যাস সাপেক্ষ। সেজন্যে যে প্রণালীতে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় ও অভ্যাসের দ্বারায় বিদ্যার্জনে অনুপ্রাণিত হয় তাহাই আদর্শ শিক্ষাদান প্রণালী। শিক্ষকের কাজ তাদের সহায়তা করা মাত্র।

এভাবে শিক্ষা দিতে হলে প্রয়োজন শিক্ষকের পরিচালনাধীনে ছাত্রছাত্রীকে কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলা যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের অধীত বিদ্যা সুচিন্তিতভাবে কর্মে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। যেমন, ভূগোল শিক্ষায় মানচিত্র অঙ্কন, মডেল চিত্র প্রভৃত তৈরী করা, আবহাওয়ার বিবরণী রাখা, শিক্ষাপ্রদ পর্যটনের (একস্‌কারশান) ব্যবস্থা করা প্রভৃতির আয়োজন করে ভূগোল শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করা যায়। তেমনি, ইতিহাস শিক্ষায় অধীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বনে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে, অভিনয়ের জন্যে পোষাকাদি তৈরী করা, মঞ্চে আলোর ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি নাটকীয়ভাবের সৃষ্টি করা প্রভৃতি কর্মের সুযোগ দিয়ে সেই সঙ্গে স্থানীয় ইতিহাস অধ্যয়ন এবং আলোচনা করার ও ছোটোখাটো ঐতিহাসিক প্রদর্শনশালা স্থাপনের প্রেরণা দিয়ে ইতিহাস শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়, সেইমত ভাষা শিক্ষায়, বিশেষ করে মাতৃভাষা শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ পছন্দ মত প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনায় উৎসাহিত করা যেতে পারে, এছাড়া পুস্তিকার সম্পাদনা, বাঁধাই, ইংরেজী ভাষার সহজ সহজ প্রবন্ধ গল্প ইত্যাদির অনুবাদ করা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে অধীত বিদ্যার অনুশীলনের সুযোগ ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া

যায়। বিদ্যালয়ে নিয়মিত সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের দ্বারাও একাজ করা যায়। এভাবে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয়ই কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রীর কাছে বিদ্যার্জন আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। তবে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীরা যাতে সযত্নে এবং সম্পূর্ণভাবে কাজটি সম্পাদন করতে পারে সেইভাবে তাদের সহায়তা করা। উপযুক্ত শিক্ষক তাই শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাণের বিষয় চিন্তা না করে জ্ঞানার্জনের প্রকৃত উপায়টি তাকে কিভাবে আয়ত্ত করানো যায় সে বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সকল বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়নকালে সে যেন বিস্তারিত বর্ণনা, উদাহরণ প্রভৃতি অবান্তর বিষয়গুলির মধ্যে থেকে পুস্তকের তাৎপর্যটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারে, বাক্যগুলির অর্থ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে সেইভাবে তাকে নির্দেশ দিয়ে অধ্যয়নের কৌশলটি শিখিয়ে দেবেন। আর সকল বিষয় যাতে সে স্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারে, বিচার বিবেচনা করতে পারে সেইসঙ্গে কথাবার্তা এবং লেখার মাধ্যমে নিজের ভাবটি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে সেইভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের কথাও শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে।

কমিশন শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত গৃহকাজ বা হোমওয়ার্ক দেওয়ার পক্ষপাতী নন্। তাঁদের মতে গৃহকাজের চাপ বেশী হলে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি ত হয়ই উপরন্তু কাজ করার ঠিক ঠিক অভ্যাসটি তারা আয়ত্ত করতে পারে না। কোনোরকমে গৃহকাজগুলি করে রেখে দায়মুক্ত হয় মাত্র। তবে উচ্চশ্রেণীতে পরিমিত গৃহকাজ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সেগুলির নিয়মিত পরীক্ষা করে ভুল সংশোধন করা এবং শিক্ষার্থীদের সেই সকল ভুল সম্বন্ধে সচেতন করা অবশ্য কর্তব্য একথা শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে।

ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় অনুরাগের সৃষ্টি করতে পারলে তারা

নিজেরাই অবসর সময়ে বিভিন্ন রকম পুস্তক পাঠ, তালিকা রচনা, প্রবন্ধ লেখা, মডেল ডায়্যাগ্রাম প্রভৃতি তৈরী করা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ করবে।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের আগ্রহের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুবিষয় জানবার ও শেখবার আগ্রহের সৃষ্টি করাও সুশিক্ষার লক্ষণ। সুস্থ এবং স্বাভাবিক নবযৌবনোন্মুখ ছাত্রছাত্রী মাত্রেরই বিভিন্ন রকমের কৌতূহল থাকে, আর সুশিক্ষকের কর্তব্য শ্রেণীতে, খেলার মাঠে, বিদেশ ভ্রমণকালে এবং অন্যান্য নানারকম কাজে তাদের নতুন নতুন কৌতূহল উদ্দীপিত করা। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানতৃষ্ণা থেকে তাদের বহু অভিজ্ঞতালাভ হবে এবং অনেক কিছু শিখবে ও তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই সেজন্যে অন্ততঃ একটি পিরিয়ডে শিক্ষকের পরিচালনাধীনে শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের পছন্দমত সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপ এবং বিভিন্ন রকম জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি চরিতার্থের উপযোগী কাজকর্ম স্বতন্ত্রভাবে অথবা সঙ্ঘবদ্ধভাবে করার সুযোগ পায় সেরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব মেনে চলা কিংবা নেতৃত্ব করা প্রভৃতি গুণগুলি আয়ত্ত করার জন্যে যেমন সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার এবং খেলাধূলো করার সুযোগ শিক্ষার্থীদের দেওয়া কর্তব্য তেমনি অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের দায়িত্বে বা আত্মচেষ্টায় স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সুবিধাও বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সুযোগ পেলে তাদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা বাড়বে। শিক্ষকেরাও তাদের যোগ্যতা ও মেধার পার্থক্য লক্ষ্য করে শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষাদান প্রণালী ও বিভিন্নরকম সামর্থ ও প্রয়োজনের অনুরূপ করে তোলার সুযোগ পাবেন।

বুদ্ধিমান, সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন ও স্থূলবুদ্ধি এই তিন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে একই ধরণের শিক্ষাদান বিজ্ঞানসম্মত নয়।

আদর্শ শিক্ষাদান প্রণালীর লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের আগ্রহ সৃষ্টি করা, কিন্তু এই আগ্রহ বা জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তি শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠের দ্বারা সম্ভব নয়, পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও নিয়মবদ্ধ জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্তির জন্যে প্রয়োজন বিদ্যালয়ে ভাল পুস্তকাগার বা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা।

কিন্তু কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করে যে কোনো একটি ঘরে সেগুলির সমাবেশ করে একজন সাধারণ শিক্ষক অথবা বিদ্যালয়ের কেরাণীর ওপর এই পুস্তকসংগ্রহশালার ভার দিলেই বিদ্যালয়ের কর্তব্য শেষ হয় না। এর জন্যে প্রয়োজন একটি সুপরিচালিত এবং যথার্থ গ্রন্থ আগারের ও একজন অভিজ্ঞ এবং বিদ্যানুরাগী গ্রন্থাগারিকের।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি বিদ্যার্থীদের কাছে প্রথমে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, সেজন্যে একটি প্রশস্ত এবং প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত গৃহ কমিশনের মতে গ্রন্থাগারের জন্যে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন, আর চেয়ার, টেবিল, বুক্-সেলফ্ প্রভৃতি আবশ্যকীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করাও দরকার। এ ছাড়া সম্ভব হলে ফুল এবং ভাল ভাল ছবির ব্যবস্থা করে এবং ঘরের দেওয়ালে যথোপযুক্ত রং লাগিয়ে ঘরটি আরও আকর্ষণীয় করে তোলা উচিত। এরপর প্রয়োজন গ্রন্থাগারে উন্নতশ্রেণীর এবং বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন প্রকার মেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ, মাসিকপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতির সমাবেশ করা। পুস্তক নির্বাচনের জন্যে শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের যথার্থ পুস্তক পাঠের অনুরাগ আছে এবং নিয়মিত যাঁরা পুস্তক, পত্রিকা ও পুস্তকের সমালোচনা পড়েন, পুস্তকের দোকানে যাতায়াত করেন তাঁদের নিয়ে একটি ছোটখাট কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি শিশুরা কি

ধরণের পুস্তক পছন্দ করে তাহা পরীক্ষা করে সেই ধরণের পুস্তকও নির্বাচন করবেন। পুস্তক নির্বাচনে উচ্চশ্রেণীর পাঠানুরাগী ছাত্রছাত্রীদেরও সহায়তা করার সুযোগ দিতে হবে।

এর পরেই প্রয়োজন একজন যোগ্য গ্রন্থাগারিকের, বিদ্যালয়ে তাঁর 'ফুল-টাইম' চাকরী হবে এবং বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের মত বেতন ইত্যাদির সুবিধাও তিনি পাবেন। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে সর্বতোভাবে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্তির আয়োজন করা। কমিশনের মতে শিক্ষকদেরও ট্রেনিং কলেজে এবং 'রিফ্রেশার' কোর্সে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় কাজকর্মের সাধারণ জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের আরও কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ হচ্ছে বিদ্যালয়ে একজন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর শাখা হিসেবে থাকবে ক্লাশটিচার্সদের পরিচালনাধীনে ক্লাশ-লাইব্রেরী এবং বিভিন্ন-বিষয়-শিক্ষকদের অধীনে সাব্জেক্ট-লাইব্রেরী। শ্রেণী বা ক্লাশ-লাইব্রেরীর বই ঘন ঘন বদলাবার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ক্লাশে বিভিন্নরকম বই পড়ার সুযোগ পায়। সাব্জেক্ট-লাইব্রেরী থেকে শিক্ষকেরা নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পুস্তক পাঠের সুযোগ পাবেন এবং নিজ নিজ বিষয়ের শিক্ষাদানেরও উন্নতি করতে পারবেন। সাব্জেক্ট-লাইব্রেরীতে অবশ্য সেজন্যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও 'রেফারেন্স' পুস্তক এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় উন্নত ধরণের পুস্তকও রাখার ব্যবস্থাও করতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক পাব্লিক লাইব্রেরীতে শিশু এবং নবযৌবনোন্মুখ বিদ্যার্থীদের পাঠোপযোগী পুস্তকের একটি বিভাগ রাখতে হবে, আর যেখানে পাব্লিক লাইব্রেরী নেই সেখানে সাধারণের জন্যে স্কুল-লাইব্রেরী বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্যসময়ও খোলা রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের জন্যে বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশের সময়েও লাইব্রেরী খোলা রাখার প্রয়োজন।

শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করার জন্যে মিউজিয়াম, রেডিও, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ আবশ্যক কমিশন মনে করেন। বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদেবার ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে তবে এ বিষয়ে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যেমন, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা এবং শিশু শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার উপযোগী প্রণালীতে বেতার মারফৎ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য যোগ্য শিক্ষকেরা মিলিত হয়ে স্থির করবেন কোন্ কোন্ বিষয়, কিভাবে ও কোন্ কোন্ ব্যক্তির দ্বারায় বেতার যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

শিক্ষার্থীরা যাতে লাইব্রেরীর পুস্তক ঠিকমত ব্যবহার করতে শেখে এবং অবসর সময়ে অবাধে পুস্তক নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে সেজন্যে কমিশন লাইব্রেরীতে ওপেন্ সেলফ্ সিস্টেম্ বা পুস্তকের আলমারী সকলের জন্যে উন্মুক্ত রাখার প্রথা প্রবর্তনের পক্ষপাতী।

———

—চার—

চারিত্রিক শিক্ষা।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বপ্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের আদর্শ চরিত্র গঠনের উপযোগী শিক্ষাদান। বিদ্যালয় হচ্ছে বৃহত্তর একটি সমাজের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র সমাজ বিশেষ, আর সারাদিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয়ে থাকে, অতএব তাদের সদাচারী করে তোলা একমাত্র বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও প্রভাবের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজ, গৃহ ও বিদ্যালয়, এই তিনের প্রভাবেই গড়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের চরিত্র। তাই প্রয়োজন বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে সমাজ, গৃহ, সেই সঙ্গে রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকল পরিবেশের সামঞ্জস্যসাধন। বিশেষ করে গৃহপরিবেশের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরিবেশের এবং শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকদের যোগাযোগ একান্ত আবশ্যক। অভিভাবক এবং শিক্ষক পরস্পরে আলাপআলোচনার দ্বারা গৃহে ও বিদ্যালয়ে যতদূর সম্ভব এক ধরণের পরিবেশের সৃষ্টি করবেন।

তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে ছাত্রছাত্রীর চরিত্র গঠনে সুপরিচালিত এবং সুশাসিত বিদ্যালয়ের প্রভাব সর্বাধিক। দ্বিতীয় পরিবার স্বরূপ বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরে স্নেহ-ভালবাসায় আবদ্ধ ও উভয়েই স্বেচ্ছায় নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত, শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের সূত্রপাত হয় আর এরূপ পরিবেশের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে তারা গৃহ ও অন্যান্য পরিবেশের অসম্পূর্ণতাও অতিক্রম করতে সমর্থ হয়।

চরিত্র বলতে বোঝায় মানুষের ইচ্ছাকৃত ব্যবহারের সমষ্টি, সেজন্যে বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট পিরিয়ডে কিংবা কোন বিশেষ শিক্ষকের

প্রভাবে অথবা কতকগুলি বিশেষ কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষার্থীদের সদাচারী করা যায় না। সামাজিক, নৈতিক, দৈহিক এবং বিদ্যালয়ের নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতি সকল রকম কর্মের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে মানুষের চরিত্র. অতএব শিক্ষার্থী যাতে সকল ক্ষেত্রে এবং সকল অবস্থায় বিচার করে নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে এবং নিপুণ-ভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে যাতে সে আপন কর্তব্য পালন করতে পারে সেইভাবে তাকে পরিচালিত করাই বিদ্যালয়ের কাজ। তবে কোনরকম শাস্তিদানের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, এর জন্যে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজ মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে যাতে স্বেচ্ছায় তারা সকল কাজ সুসম্পন্ন করতে এবং নিজেদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী হয়। আর সর্বদা আচারব্যবহারের উচ্চ আদর্শও তাদের সামনে স্থাপন করতে হবে যার প্রভাবে তারা নিজেরাই সদাচারী হতে চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে আদর্শ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠে শিক্ষার্থীদের সর্বদা উৎসাহিত করা প্রয়োজন, কারণ চরিত্র গঠনে উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণই অধিকতর কার্যকরী। শিক্ষকেরাও সেজন্যে ইতিহাস, ভূগোল, সোশ্যাল স্টাডিস্ প্রভৃতি মানবীয় বিষয়গুলি তাদের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে বিশ্বজগৎ ও মনুষ্যজাতির সম্বন্ধে বিশেষ করে মানুষের ব্যক্তিগত এবং দলগত পারস্পরিক সম্বন্ধ, যুগে যুগে মনুষ্যকৃত মহৎকর্ম এবং এ সকল মহৎকর্ম সাধনের জন্যে কিরূপ ব্যবহার, দক্ষতা, ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে প্রভৃতির সম্যক উপলব্ধি তাদের হয় এবং সেই আদর্শে নিজেদের জীবন ও চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত হয়। এছাড়া, শিক্ষক, অভিভাবক, এবং সমাজের জ্ঞানী, গুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা সংযত, ন্যায়পরায়ণ,

কর্তব্যনিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে তাদের সামনে জীবন্ত উদাহরণ স্থাপন করবেন।

দেশের যুবসম্প্রদায়কে সদাচারী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক রূপে গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে তাদের নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এ ক্ষেত্রেও বাইরে থেকে জোর করে অথবা শাস্তিপ্রদান করে শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তী করা সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের অনুশাসন মেনে চলবে। শিক্ষক-মণ্ডলীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে এবং তাঁদের প্রতি ছাত্রছাত্রীর যুগপৎ ভয়, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ভাব থাকলে তবেই তারা শিক্ষকদের তথা বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলা স্বেচ্ছায় মেনে নেবে। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে শ্রেণী-কক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যাতে অত্যাধিক না হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আবার শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখার এবং শিক্ষকদের নিয়মনিষ্ঠ হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন।

এরূপ অনুকূল বিদ্যালয়-পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধির ওপর তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বিদ্যালয়ের অনুশাসন ঠিকমত মানা হচ্চে কিনা এবং না হলে অনুশাসন মানাতে তাদের বাধ্য করার ভার দেয়. সেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। কমিশন এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে প্রিফেক্ট, মনিটর, স্টুডেণ্ট কাউন্সিল প্রভৃতি নির্বাচন করে বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলা এবং সুনাম বজায় রাখার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করে বিদ্যালয়ে হাউস-সস্টেম্ ধিরণের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করার পক্ষপাতী।

শিক্ষার্থীদের নিয়মানুগ করে তোলার অন্ত উপায় হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ এবং খেলাধূলো। সেজন্যে বিদ্যালয়ে সঙ্ঘবদ্ধ খেলাধূলো, এবং বয়েজ্ স্কাউটস্, গার্লগাইডস্, ন্যাশন্যাল ক্যাডেট্ কোর (এন, সি, সি), জুনিয়র রেড ক্রশ, ফার্স্ট এড, সেণ্ট জন এ্যামবুলেন্স প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বয়েজ্ স্কাউটস্ এবং গার্লগাইড্সে এমন কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ এবং খেলাধূলোর ব্যবস্থা আছে যেগুলির সাহায্যে অতি সহজে শিক্ষার্থীদের সদাচরণ, সমাজ সেবা, নেতৃত্ব মেনে চলা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং সকল প্রকার অবস্থার সম্মুখীন হবার মত তৎপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি আয়ত্ত করানো যায়। কমিশনের মতে প্রাদেশিক সরকারদের কর্তব্য এধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথোচিত অর্থ সাহায্য এবং স্কাউটস্ ক্যাম্পের জন্যে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহে সহায়তা করা। এই প্রসঙ্গে কমিশন বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর জন্যে 'সামার ক্যাম্পস্' এবং 'হলিডে হোমস্' স্থাপনের কথাও বলেছেন। বছরে কয়েকদিন মাত্রও এরূপ ক্যাম্পে এবং হোমে থাকার সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীরা সহজে আত্মনির্ভর হতে শিখবে, সেই সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার উপযোগিতা ও শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করবে এবং যৌথজীবন সম্বন্ধে একটি সুন্দর ধারণাও তাদের হবে।

ন্যাশন্যাল ক্যাডেট্ কোরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৈনিকের ন্যায় কঠোরতার সঙ্গে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে নিজ নিজ কর্তব্যপালনে অভ্যস্ত করানো যায়। সকল বিদ্যালয়ে যাতে এন, সি, সির প্রবর্তন করা যায় সেরূপ ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

এ ছাড়া, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে সমাজ সেবায় অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে তাদের ফার্স্ট এড, জুনিয়র রেডক্রশ, সেণ্ট জন এ্যামবুল্যেন্স প্রভৃতির ট্রেনিং দেওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং প্রয়োজন হলে মেলা, বন্যা,

মহামারী প্রভৃতির জন্যে যেখানে অধিক লোকের সমাবেশ হবে সেখানে ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীকে সমাজসেবামূলক কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে।

শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রকৃতপক্ষে নিয়মানুগ করে তোলার জন্যে কমিশনের বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দ্বারা ১৭ বছরের কম বয়সী ছাত্রছাত্রীকে রাজনৈতিক প্রচার অথবা নির্বাচন প্রতিযোগিতার কাজে লাগানো 'ইলেক্‌শন অফেন্স' বলে ঘোষণা করা অবশ্য কর্তব্য।

শিক্ষার্থীদের আত্মচেষ্টায় কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে সন্তরণ, নৌচালনা, নাটক অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, উদ্যাননির্মাণ প্রভৃতি পাঠবিষয় বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপগুলি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। শিক্ষকমণ্ডলীরও অবশ্য কর্তব্য একাজে শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করার জন্যে কিছুক্ষণের জন্যেও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া। কমিশনের মতে শিক্ষাবিভাগেরও কর্তব্য এধরণের ক্রিয়া অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে যথোচিত অর্থ সাহায্য করা।

শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার প্রভাবও কম নয়। তবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সকলকে বিশেষ কোনো ধর্মের শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যকাল ছাড়া অন্য যে কোনো সময়ে শিক্ষার্থীদের মনে যাতে ধর্মের গোঁড়ামী এবং পরধর্মবিদ্বেষ না জন্মায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট ধর্মের উপদেশ দেওয়া চলতে পারে। আর সকল ছাত্রছাত্রীকে সর্বকালের এবং সর্বদেশের মহাপুরুষদের জীবনী এবং বাণী থেকে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা নীতিশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

—পাঁচ—

শিক্ষাবিষয়ক ও বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচনে পথ প্রদর্শন।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বহুমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় বিদ্যার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় ও জীবিকাগত পেশা নির্বাচনে সহায়তা করার অতিরিক্ত দায়িত্ব বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের ওপর অর্পিত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও শিক্ষকমণ্ডলী ও উপদেষ্টাদের স্মরণ রাখতে হবে যে বিদ্যার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের জন্যে বাছাই করাই তাঁদের প্রকৃত কর্তব্য নয়, তারা নিজেরাই যাতে নিজেদের যোগ্যতা, মেধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচন করতে পারে সেইভাবে তাদের পরিচালিত করাই তাঁদের কাজ। এই উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন তাদের নিজেদের যোগ্যতা, প্রবণতা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে অপরদিকে যেখানে তাদের জীবনযাপন ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে সেই বহির্জগতের যাবতীয় সংবাদও সরবরাহ করা প্রয়োজন। কয়েকজন মাত্র বিশেষজ্ঞের পক্ষে এ দায়িত্ব যথাযথ পালন করা সম্ভব নয়, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদেরই বিশেষজ্ঞের পরিচালনাধীনে একাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর শুধু বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচনেই নয় শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই তাদের এভাবে যথোপযুক্ত পথপ্রদর্শনের আবশ্যক।

কমিশনের মতে প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বিদ্যার্থীদের শিক্ষা-বিষয়ক ও বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচনে উপদেশ দেবার জন্যে যোগ্য এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত উপদেষ্টা বা গাইডেন্স অফিসারদের এবং কেরিয়ার মাষ্টারদের সহযোগিতা গ্রহণের ব্যবস্থা ক্রমশঃ করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে

যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষাবিষয়ক উপদেশদান সম্বন্ধীয় বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। প্রাদেশিক সরকারেরা উপযুক্ত ব্যক্তিদের এবং শিক্ষকদের ঐ সকল শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠাবেন শিক্ষাগ্রহণের জন্যে।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্য, ব্যবসায় ও কলকারখানার কর্মের রীতিনীতি, প্রয়োজন, সুযোগসুবিধা এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দানের জন্যে উপযুক্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করার কথাও কমিশন বলেছেন। চলচ্চিত্রের সাহায্যে শিল্পবাণিজ্যিক কর্মের গতিপ্রকৃতি এবং শর্ত প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছাড়াও এরূপ কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের দৈনন্দিন কার্যধারার সংবাদ সরবরাহ করাও আবশ্যক।

শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টার বহু গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। যুবকযুবতী এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর ঠিক ঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, আবার যুবকযুবতীদের জন্যে তাঁর সহানুভূতি থাকাও দরকার যাতে জীবনটা তাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে তিনি সমর্থ হন। এছাড়া, উপদেশদানের বা পথপ্রদর্শনের উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীও তাঁকে জানতে হবে সেইসঙ্গে বৃত্তিমূলক উপদেশদানের জন্যে বিভিন্ন কর্মের সুযোগসুবিধার ও সঠিক জ্ঞান তাঁকে অর্জন করতে হবে। অভিভাবক, শিল্পবাণিজ্যের মালিক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্যে যথেষ্ট সময় তাঁর থাকা প্রয়োজন, বিদ্যালয়ের কার্যক্রম তিনি জেনে রাখবেন এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার যোগ্যতাও তাঁর থাকা আবশ্যক। কারণ শিক্ষকদের সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীর সম্বন্ধ হয় ঘনিষ্ট এবং শিক্ষকদের কাছ থেকেই উপদেষ্টা ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন। তাঁরাও উপদেষ্টার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন।

———

—ছয়—

বিদ্যার্থীদের শারীরিক উন্নতি সাধনের উপায়।

দেশের যুবসম্প্রদায়ের শরীরিক উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা রাজ্য-সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অতএব বিদ্যার্থীদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের ও দৈহিক যোগ্যতা রক্ষার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। সকল বিদ্যালয়ে সেজন্যে শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ছাত্রছাত্রীকে দেহ ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সদ্ভ্যাস গঠনের ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে যাতে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের উপায়গুলি তাদের আয়ত্ত হয়ে যায়।

সরকার পক্ষের কর্তব্য বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নতি করে একটি সুপরিচালিত স্কুল মেডিক্যাল সার্ভিস্ গঠন করা এবং এর সহায়তায় বিদ্যালয়ে থাকাকালীন বছরে অন্ততঃ একবার ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, আর একবার বিদ্যালয় ত্যাগের ঠিক পূর্বে এইভাবে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। যাদের কোনো মারাত্মক রোগ অথবা গুরুতর বৈকল্য ধরা পড়বে তাদের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করানোর এবং প্রয়োজনমত সংশোধনক্ষম ও প্রতিকারসাধক চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য।

সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিবরণীর তিনখানি প্রতিলিপি থাকবে, একটি স্কুল মেডিক্যাল অফিসারের কাছে, দ্বিতীয়টি অভিভাবকের কাছে এবং তৃতীয় প্রতিলিপিটি থাকবে বিশেষ মণ্ডলীভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে। তৃতীয় প্রতি-লিপিটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত (পারসোন্যাল) রেকর্ডের অংশ বিশেষ হবে এবং এর ওপর নির্ভর করে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ দানের

ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্কুল মেডিক্যাল অফিসারের কর্তব্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিবরণী দেখে যাদের সংশোধনক্ষম ও প্রতিকারসাধক চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের চিকিৎসার জন্যে নির্ধারিত করা। এইভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা সমগ্র বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ছাত্রছাত্রীরা সর্বদা শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকে অতএব তাদের দৃষ্টিশক্তির শ্রবণশক্তির এবং অঙ্গবিন্যাসের বৈকল্য অথবা দোষ প্রথমাবস্থায় তাঁরই লক্ষ্য করা উচিত। কমিশনের মতে এই উদ্দেশ্যে ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকদের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান এবং শারীরিক স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম বা বৈকল্য লক্ষ্য করার বিশেষ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর উপযুক্ত সরঞ্জাম সমন্বিত হাসপাতালে শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষণের এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে হবে। সপ্তাহে একদিন কিংবা দু'দিন বিকালে শিক্ষক, মেডিক্যাল অফিসার অথবা স্বাস্থ্য-উপদেষ্টা রোগাক্রান্ত ছেলে-মেয়েদের হাসপাতালে নিয়ে আসবেন বিশেষজ্ঞের পরামর্শের জন্যে। সম্পূর্ণ অপরাহ্ন বেলাটাই এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট রাখতে পারলে ভাল কমিশন মনে করেন। এইভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলদেশ ও বক্ষ সংক্রান্ত ব্যাধির বিশেষজ্ঞেরা এবং একজন চিকিৎসক একযোগে বিদ্যার্থীদের অসুস্থতা এবং বৈকল্য নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। যাদের পুনঃ পুনঃ হাসপাতালে আসা প্রয়োজন তাদেরও অপরাহ্ন বেলায় আসার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে অথবা প্রতিকার-সাধক উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হবে এবং যে শিক্ষক তাদের হাসপাতালে আনবেন তিনিই দেখবেন চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের উপদেশ তারা ঠিকমত পালন করছে কিনা।

সকল প্রকার শারীরিক অসুস্থতার অন্যতম কারণ অপুষ্টি।

নবযৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েদের পক্ষে অপুষ্টি মারাত্মক বলা যেতে পারে, সেজন্যে আবাসিক বিদ্যালয়ে এবং হোস্টেলে পুষ্টিকর খাদ্যসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের নির্দেশমত বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী সুষম খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের গৃহ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বাস্থ্যকর না হলে বিদ্যালয়ে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের সকল ব্যবস্থা এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। অবশ্য বাহিরের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়, তথাপি ছাত্র এবং অভিভাবক তথা জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করে এবং কিভাবে তারা নিজেরাই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে সেইসঙ্গে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে বিদ্যালয় বাহিরের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। কমিশনের মতে যেখানে সম্ভব স্থানীয় পরিবেশের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে বিদ্যালয়েরও সহযোগিতা করা উচিত এবং এইভাবে সহযোগিতা করার সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীরাও সহজে শ্রমের মর্যাদা করতে শিখবে।

বিদ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের জন্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের এবং সদ্ভ্যাস গঠনের মতই বিদ্যালয়ে তাদের দেহ ও মনের বিকাশ-সাধনের এবং দৈহিক যোগ্যতা রক্ষার নিমিত্ত শরীরচর্চার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। তবে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ড্রিল বা ঐধরণের কতকগুলি নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের শরীর-চর্চা হতে পারে না। কমিশনের মতে শরীর ও মনের বিকাশসাধনের সহায়ক সকল রকম কাজ এবং খেলাধূলোই যেমন, সন্তরণ, নৌচালনা ও সঙ্ঘবদ্ধ খেলাধূলো ইত্যাদি শরীরচর্চার পক্ষে আবশ্যক যাতে আমোদ-প্রমোদমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চাও হবে সেইসঙ্গে পরস্পরে মিলিত হয়ে কাজ করা, খেলোয়াড়ের প্রকৃত

মনোভাব অর্জন অর্থাৎ জয়লাভে অধীর এবং পরাজয়ে হতাশ না হওয়া, প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করা ও জয়লাভের জন্যে অসদুপায় অবলম্বন না করা ইত্যাদি এবং অপরের প্রতি যথা-যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলিও তারা অর্জন করতে পারবে। অবশ্য শরীর গঠনোপযোগী ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ক্ষমতা ও সহ্যশক্তির বিচার করে নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং তাদের শরীরচর্চার ব্যবস্থায় সকল শিক্ষকেরই, বিশেষ করে যাঁদের বয়স চল্লিশের কম তাঁদের সকলেরই যোগদান করা কর্তব্য, কেবলমাত্র ফিজিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাক্‌টার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের যথার্থ শারীরিক শিক্ষাদান সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে স্কুল রেকর্ডস্‌-এর মত ছেলেমেয়েদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপেরও পূর্ণ বিবরণ রাখা সমীচীন কমিশন মনে করেন। তাঁদের মতে এইভাবে স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থাও বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অপরিহার্য অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের ফিজিক্যাল এডুকেশনের বিশেষ শিক্ষাদানের সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা, পোষ্টাই খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও থাকা দরকার আর ফিজিক্যাল ইন্‌ষ্ট্রাক্‌টারদের অন্ততঃপক্ষে সেকেণ্ডারী স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার এবং শিক্ষাদানের সাধারণ কতকগুলি নিয়ম ও শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাঁরা শারীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষাদানের সঙ্গেও যুক্ত থাকবেন এবং একইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের মত সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা তাঁদেরও প্রাপ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন মনে করেন প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে এবং যেখানে প্রয়োজন নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে ও সমগ্র দেশের সুবিধার্থে

কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্রকে সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত করে ফিজিক্যাল এডুকেশনের ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয় তরফ থেকেই সাহায্য দানের ব্যবস্থা থাকবে।

—সাত—

পরীক্ষা ব্যবস্থার নবরূপায়ণ।

শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের গুণ, যোগ্যতা এবং বিদ্যাবত্তার বিচার করা হয়ে থাকে আবার এই পরীক্ষার মাধ্যমেই বোঝা যায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিনা। তাই শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র এবং জনসাধারণ কেউই পরীক্ষার উপযোগিতা অস্বীকার করতে পারেন না। তবে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মত এর পরীক্ষণব্যবস্থারও পুনর্গঠন এবং সংশোধন প্রয়োজন।

সাধারণতঃ দু'রকমের পরীক্ষা প্রচলিত, বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বা ইণ্টারন্যাল এগজ্যামিনেশনস্ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে গৃহীত বহিঃপরীক্ষা বা এক্‌স্‌টারন্যাল কিংবা পাব্‌লিক এগজ্যামিনেশনস্। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ টার্মিন্যাল বা ত্রৈমাসিক সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা শিক্ষার্থীদের অধীত বিষয়ের এবং অর্জিত জ্ঞানের বিচার করা হয়ে থাকে। তবে বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ সকল বিদ্যালয়েরই সাধারণ নিয়ম এবং এর ওপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কারণ বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে বছরের শেষে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়ে থাকে।

বহিঃপরীক্ষার দ্বারা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার শেষে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা নিরূপণ করে পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়, মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে যেমন প্রবেশিকা

পরীক্ষা অথবা স্কুল ফাইন্যাল কিংবা স্কুল সার্টিফিকেট এগজ্যামিনেশনের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া, কোনো কোনো প্রদেশে প্রাথমিক এবং মধ্যবিদ্যালয় স্তরের শেষেও বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়।

উভয়বিধ পরীক্ষার আদর্শ এবং ধারা প্রায় একই রকম, এরূপ পরীক্ষাব্যবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অর্জিত বিদ্যারই বিচার করা হয় মাত্র, শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর সর্বতোমুখী বিকাশসাধন হচ্ছে কিনা তাহা নির্ণয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। বুদ্ধিগতজ্ঞান বা শিক্ষার পরিচয়ও আবার এরূপ পরীক্ষার দ্বারা ঠিকমত পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ এতে প্রবন্ধমূলক প্রশ্নের উত্তরের বিচার পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়, এই জন্যেই বিভিন্ন পরীক্ষক একই প্রশ্নের উত্তরের বিভিন্ন রকম মূল্য নিরূপণ করেন, এমনকি একই পরীক্ষক অনেক সময়ে একই উত্তরের বিভিন্ন রকম বিচার করেন। এরূপ পরীক্ষাব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্খা থাকে না, তাদের একমাত্র লক্ষ্য কোনরকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবেও যাহা পরীক্ষাধীন নয় সেরূপ বিষয় শিক্ষালাভের কোনো আগ্রহই তাদের থাকে না এবং শিক্ষালাভের উপায়স্বরূপ পাঠ্যপুস্তক অথবা মূলগ্রন্থ পাঠ অপেক্ষা টীকা কিংবা নোট পড়ে মুখস্থ করার আকর্ষণ তাদের বেশী।

শিক্ষক এবং অভিভাবকও পরীক্ষাব্যবস্থার দ্বারা কম প্রভাবিত নন্। শিক্ষার্থীদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির পরীক্ষা অসম্ভব না হলেও দুরূহ সন্দেহ নেই অথচ বুদ্ধিবৃত্তিগত উন্নতির পরিচয় অনেক সহজে পাওয়া যায়। তাছাড়া, দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের সুনাম, যোগ্যতা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে তাঁদের ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফলের ওপর। সুতরাং তাঁরাও বিদ্যার্থীদের যথার্থ

জ্ঞানদানের পরিবর্তে কোনরকমে তাদের পরীক্ষায় পাশ করার মত তৈরী করে দেওয়াই কর্তব্য মনে করেন। আর যেহেতু পরীক্ষায়, বিশেষ করে বহিঃপরীক্ষায় কৃতকার্য হলে তবেই চাকুরী লাভ সম্ভব তাই পিতামাতা এবং অভিভাবকেরাও চান যে কোন উপায়ে তাঁদের সন্তানেরা যেন পরীক্ষার গণ্ডী পার হতে পারে। এইভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর অযথা গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, শিক্ষার বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে শিক্ষাদান প্রণালী প্রভৃতি সকল বিষয় পরীক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করেই নির্ধারিত হয়ে আসছে। কিন্তু পরীক্ষাকে যদি যোগ্যতা এবং গুণ বিচারের মাপকাঠি হিসেবে শিক্ষনীয় বিষয় এবং শিক্ষাদান প্রণালীর ধারা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহলে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই এর দ্বারা উপকার সাধিত হবে; পরীক্ষার জন্যেই ছাত্র অধীত বিদ্যার পুনরালোচনার প্রেরণা পাবে এবং শিক্ষকও ছাত্রকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার উৎসাহে নিজের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন তাই প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলির প্রতিকার করে পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের জন্যে কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমতঃ, কমিশনের মতে বহিঃপরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে একটি মাত্র বহিঃপরীক্ষা বা পাব্‌লিক এগজ্যামিনেশনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, এর আগে আর কোনো বহিঃপরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি বিষয়ের যোগ্যতা বিচার করার পক্ষে প্রচলিত প্রবন্ধমূলক পরীক্ষার আবশ্যক থাকলেও এতে ব্যক্তিগত মতামত, মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বেশী, তাই শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরীক্ষণে সাবজেক্‌টিভ টেষ্ট্‌স্‌এর অথবা প্রবন্ধাকারে লিখিত উত্তর দেওয়ার প্রশ্নের সংখ্যা

কমিয়ে অব্জেক্টিভ টেষ্টস্এর বা বিষয়গত জ্ঞানের সঠিক বিচারের জন্যে নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার মত ছোট ছোট প্রশ্ন করার রীতি প্রবর্তন করা আবশ্যক, তৃতীয়তঃ, পরীক্ষার প্রশ্নমালার পরিবর্তন করে এমন ধরণের প্রশ্ন করা প্রয়োজন যাতে ঠিক ঠিক উত্তর লিখতে হলে শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে লিখতে হবে, কতকগুলি নির্দি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে রাখলে এরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না। প্রশ্নগুলি ছোট ছোট হবে এবং উত্তরও হবে সংক্ষিপ্ত, এরূপ প্রশ্নের দ্বারা বিষয়বস্তুর জ্ঞান যথার্থ পরীক্ষা করা যায়। একই দিনে তিনঘণ্টা করে ছ'ঘণ্টায় দুটি পেপারের পরীক্ষা গ্রহণও কমিশন সমর্থন করেন না। পরিশেষে বলা যায় শিক্ষার্থীদের গুণ ও যোগ্যতার শেষ বিচারে সম্পূর্ণরূপে বহিঃপরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষক কর্তৃক রক্ষিত সারাবছরে বিদ্যালয়ে তাদের কাজের বিবরণী বা স্কুল রেকর্ডস্ও গণ্য করা দরকার। এইভাবে পরিবর্তন করে নিলে বহিঃপরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

বহিঃপরীক্ষার মত বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষারও পরিবর্তন আবশ্যক, এক্ষেত্রেও বৎসরান্তে ছাত্রছাত্রীকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করার সময় কেবলমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর না করে পর্যাবৃত্ত পরীক্ষার ফলাফল এবং স্কুল রেকর্ডস্এ উল্লিখিত সারাবছরের প্রগতির হিসেবও ধর্তব্য, আর প্রবন্ধমূলক প্রশ্নের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন করে বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

বিদ্যার্থীদের সকল বিষয়ের যোগ্যতা এবং গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় শুধুমাত্র বহিঃপরীক্ষার কিংবা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়, এর জন্যে প্রয়োজন তাদের বিদ্যালয়-জীবনের প্রতিদিনের, প্রতিমাসের এবং প্রতিবছরের পড়াশোনা ও কাজের ধারাবাহিক

বিবরণ এবং প্রগতির হিসেব রাখা, তবে এরূপ 'কিউমিউলেটিভ' রেকর্ডস্এ বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও উন্নতির বিবরণের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর আবেগ অনুভূতি ও সৃজনীশক্তির বিকাশের, ব্যক্তিত্বের লক্ষণসমূহের সমাজসেবামূলক এবং শরীরচর্চা সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপেরও সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত রাখতে হবে যাতে তাদের বিদ্যালয়-জীবনের অগ্রগতির পুর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। এধরণের বৃত্তান্ত শ্রেণী শিক্ষকের পক্ষেই রাখা সম্ভব কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাতন্ত্র্য বোঝবার সুযোগ পান আর এইভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শিক্ষাদানের সুযোগ পেলে তাঁর শিক্ষাপ্রণালীরও উন্নতি হবে। অবশ্য নির্ভুলভাবে 'কিউমিউলেটিভ' রেকর্ড রাখতে হলে শিক্ষককে ইন্‌টেলিজেন্স্ টেষ্ট্‌স্, অ্যাটেন্‌মেণ্ট্ টেষ্ট্‌স্, অ্যাপ্টিচিউড্ টেষ্ট্‌স্ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার সহায়তা গ্রহণ করতে হবে, ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকমণ্ডলীকে এধরণের পরীক্ষাদি সম্বন্ধে এবং পক্ষপাতিত্ব না করে শিক্ষার্থীদের কার্যাবলীর ধারাবাহিক বিবরণী ও উন্নতির হিসেব রাখার বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের কর্তব্য মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা শিক্ষার্থীদের 'কিউমিউলেটিভ' রেকর্ডস্‌গুলি নির্ভুল কিনা।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়, বহিঃপরীক্ষায় এবং স্কুল রেকর্ডস্এ শিক্ষার্থীদের উত্তরের মূল্যনিরূপণে সংখ্যার ব্যবহার অপেক্ষা প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা অনেক বেশী সহজ এবং নির্ভরযোগ্য কমিশন মনে করেন। এই উদ্দেশ্যে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ এই পাঁচটি প্রতীক ব্যবহার করা যেতে পারে, যারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে তাদের 'ক' এর দ্বারা, তার পরের স্তরকে 'খ' এর দ্বারা, সাধারণভাবে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের 'গ' এর দ্বারা, যারা খারাপ ফল করবে তাদের 'ঘ' এর দ্বারা

এবং যারা খুব খারাপ উত্তর দেবে তাদের 'ঙ' প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হবে, লিখিত উত্তরের মূল্য নিরূপণের সময় যুক্তভাবে 'ঘ' ও 'ঙ' প্রতীকের দ্বারা অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে গৃহীত একমাত্র পাব্লিক এগজ্যামিনেশনকেও সকলের পক্ষে আবশ্যিক করার পক্ষপাতী নন্। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে এই পরীক্ষা দিতে চাইবে না, তাদের বিদ্যালয়ের রেকর্ড এবং অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে স্কুল সার্টিফিকেট দেবার নির্দেশ কমিশন দিয়েছেন। আর যারা পাব্লিক এগজ্যামিনেশনে উত্তীর্ণ হবে তাদের সার্টিফিকেটে পাব্লিক বা বহিঃপরীক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল এবং স্কুল রেকর্ডস্এর সারাংশেরও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ শেষ বহিঃপরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ছ'টি বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, এছাড়া, অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলেও এই ছ'টি বিষয়ের ফলাফল দেখেই তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়ে থাকে। এই ছ'টি বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃ চারটি বহিঃপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক এবং বাকী দু'টির সফলতা স্কুল রেকর্ডস্এর ফলাফল থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কমিশন মনে করেন বহিঃপরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে 'কম্পার্টমেণ্টাল' পরীক্ষার সুযোগ থাকা আবশ্যক, তবে তিনবারের বেশী তাদের এ সুযোগ দেওয়া হবে না এবং এসকল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে স্কুল রেকর্ডস্এর ফলাফল ও বিবেচনা করা হবে না।

—আট—

শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবসায়।

এ কালের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান শিক্ষার্থীর পরেই। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি হয়• ছাত্রছাত্রীর সর্বতোমুখী বিকাশ-সাধন তাহলে এ কাজের প্রধান সহায় শিক্ষক ছাড়া আর কে? তাঁরই সুদক্ষ পরিচালনায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বে পূর্ণ বিকাশ সম্ভব; তিনিই প্রকৃত পক্ষে মানুষ তথা জাতি গঠন করে থাকেন। শিক্ষক তাই সকলের নিকট থেকেই শ্রেষ্ঠতম সম্মান লাভের যোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক এবং তাঁর পেশা দুইই বহুদিন থেকে অবহেলিত হয়ে আসছে। শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে তাই শিক্ষকমণ্ডলীর যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করা অত্যাবশ্যক কমিশন মনে করেন।

যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষাদান কার্য গ্রহণে অনুপ্রাণিত করার জন্যে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবসায়কে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করা থেকে শুরু করে প্রচলিত সকল ব্যবস্থারই পরিবর্তন এবং উন্নতি সাধন প্রয়োজন।

শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগ করা সম্বন্ধে কমিশনের পরামর্শ হচ্ছে, সরকারী এবং বেসরকারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ে শিক্ষক নির্বাচনে ও নিয়োগকরণে যতদূর সম্ভব সমতা থাকা আবশ্যক। সরকারী বিদ্যালয়ে পাব্‌লিক সার্ভিস্ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক, বিশেষ করে উচ্চপদস্থ শিক্ষকদের নির্বাচন করা হয়ে থাকে এবং একাজে শিক্ষা অধিকর্তা কিংবা শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারী কমিশনকে যথোচিত

পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই প্রথার অনুসরণে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতেও ক্ষুদ্রাকারের সিলেক্‌শন কমিটির ওপর শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিলেক্‌শন কমিটির এক্‌স্‌-অফিসিও মেম্বার হবেন। লোক্যাল বোর্ড অথবা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনাধীন বিদ্যালয়গুলিতেও প্রাদেশিক পাব্‌লিক সার্ভিস্‌ কমিশন অথবা ঐ জাতীয় কোনো সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্যে 'এডুকেশন' বা 'শিক্ষা' বিষয়টি নিয়ে উত্তীর্ণ স্নাতকদের গ্রহণ করা হবে, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্যে অধিকতর গুণসম্পন্ন অর্থাৎ অনার্সসহ বি, এ পাশ, কিংবা 'শিক্ষা' বিষয় নিয়ে প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ স্নাতক অথবা এম, এ পাশ শিক্ষক এবং যাঁরা শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন তাঁদের সেই সকল শিল্প-শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ের স্নাতক হওয়া বাঞ্ছনীয় উপরন্তু ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের ট্রেনিং বা বিশেষ শিক্ষাও তাঁদের গ্রহণ করতে হবে। মধ্যবিদ্যালয় স্তরেও বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ করাই ভাল কমিশন মনে করেন। স্থায়ী পদের জন্যে নিযুক্ত বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাধারণতঃ একবছরের শিক্ষানবিশির পরই কর্মে সন্নিয়োগ বা কন্‌ফারম্‌ করা প্রয়োজন। শারীরিক সক্ষম এবং অন্যান্য বিষয়েও যথেষ্ট সমর্থ শিক্ষকমণ্ডলীর কার্য থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ষাট বছর পর্যন্ত বৰ্দ্ধিত করার কথাও কমিশন বলেছেন।

শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত হল, সকল প্রকার বিদ্যালয়ে সমান গুণসম্পন্ন এবং একই প্রকার কর্তব্যে নিযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর বেতনের সমতা থাকা আবশ্যক, আর প্রত্যেক প্রদেশের কর্তব্য স্পেশাল কমিটির সহায়তায় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনর্ব্বিবেচনা করে বর্তমান সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের যতদূর সম্ভব উপযোগী বেতন নির্ধারণ করা। এছাড়া,

শিক্ষকমণ্ডলীকে নিজেদের এবং পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ করার উদ্দেশ্যে পেন্সন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ইন্সিওরেন্সের ত্রিবিধ সুবিধা দানেরই ব্যবস্থা করা, তাঁদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া এবং তাঁদের সন্তানসন্ততিরা যাতে বিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা প্রত্যেক প্রদেশেরই অবশ্য কর্তব্য। বিদ্যালয়ের সন্নিকটে শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁদের বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করাও হবে সেইসঙ্গে বিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজে তাঁদের সহযোগিতাও অনেক বেশী পাওয়া যাবে।

উচ্চাভিলাষী এবং দায়িত্বপূর্ণ পদের শিক্ষকদের বিদেশে গিয়ে পড়াশোনার জন্যে অথবা বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যে ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত 'স্টাডি লীভ' গ্রহণের সুযোগ থাকাও আবশ্যক, এ সময়ে তাঁরা পূর্ণ বেতন পাবেন এবং যাঁরা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চান তাঁদেরও বিশেষ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া, যাঁরা দীর্ঘ অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে যেতে চান কিংবা শিক্ষামূলক সভা, সম্মেলন অথবা সেমিনারে যোগদান করতে চাইবেন কমিশনের মতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কর্তব্য তাঁদের 'ট্র্যাভেল কন্সেসন' দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

অনেক সময় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শিক্ষকদের ওপর অযথা অবিচার করা হয়ে থাকে, সামান্য কারণে তাঁদের বেতনবৃদ্ধি বন্ধ করা হয়, অথবা বদলীর নির্দেশ দেওয়া হয়, এমন কি অনেক সময়ে তাঁদের কর্মচ্যুত পর্যন্ত করা হয়, এ সকল অবিচারের মীমাংসা করার জন্যে 'আরবিট্রেশন বোর্ড' গঠন করার নির্দেশও কমিশন দিয়েছেন, এই বোর্ডে থাকবেন শিক্ষা অধিকর্তা অথবা তাঁর মনোনীত কোনো ব্যক্তি, বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর একজন প্রতিনিধি এবং প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির একজন প্রতিনিধি।

এভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিক্ষকমণ্ডলীকে উদ্বেগশূন্য করতে পারলে তবেই তাঁদের পক্ষে জাতিগঠনের মহৎ কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করা সম্ভব হবে। কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত হলে অতিরিক্ত আয়ের জন্যে গৃহশিক্ষকতা করার প্রয়োজনও শিক্ষকদের থাকবে না।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্যে যোগ্য এবং শিক্ষাদান ও পরিচালনব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগ করতে হলে এই পদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাও যথেষ্ট আকর্ষণীয় করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় সমাজের গণ্যমান্য এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের কর্তব্য শিক্ষকদের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে সর্বসাধারণের কাছে আদর্শ স্থাপন করা। বিভিন্ন সভা সমিতিতে শিক্ষকদের সাদরে আহ্বান জানিয়ে এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে গণ্যমান্য ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাই পারেন শিক্ষকমণ্ডলীকে পুনরায় তাঁদের গৌরবের আসনে বসাতে। শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি-কল্পে তাঁদের শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানদানের ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কমিশন মনে করেন দু'স্তরের শিক্ষকদের জন্যে দু'প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্কুল লিভিং অথবা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল লিভিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অবশ্য কর্তব্য, এরপর তাঁদের সেকেণ্ডারী গ্রেড ট্রেনিং কলেজে দু'বছর শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালীর বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের ফার্স্টগ্রেড টিচার্স ট্রেনিং কলেজে একবছর বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তবে ভবিষ্যতে গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাকাল আরও একবছর বাড়াতে পারলে ভাল। ফার্স্টগ্রেড

টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হবে এবং উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা বিতরণ করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। সেকেণ্ডারী গ্রেড ট্রেনিং কলেজগুলি একটি স্বতন্ত্র বোর্ড কতৃক পরিচালিত হবে। শিক্ষকতা সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের জন্যে প্রত্যেক ট্রেনিং কলেজে একটি করে ডিমন্স্ট্রেশন বা মডেল স্কুল থাকা আবশ্যক। এছাড়া, কাছাকাছি কতকগুলি বিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা থাকবে। ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে 'কিউমিউলেটিভ রেকর্ড' রাখা, লাইব্রেরী পিরিয়ড পরিচালনা, স্কল্যাষ্টিক্ টেষ্ট্স্ প্রভৃতির রচনা এবং প্রয়োগ করা ইত্যাদি বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ কমিশন দিয়েছেন।

গ্রন্থাগারিকের কাজ, শরীরচর্চা ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউটিং এবং গাইডিং, বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের দু'একটি বিষয়ের বিশেষ শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষককেই গ্রহণ করতে হবে।

ট্রেনিং কলেজে 'রিফ্রেশার' কোর্স, 'শর্টইন্টেনশিভ' কোর্স, সেমিনার, কলকারখানার ব্যবহারিক শিক্ষার এবং অধ্যাপনা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার ব্যবস্থাও রাখতে হবে, গবেষণা কার্যের জন্যে ট্রেনিং কলেজের পরিচালনাধীনে থাকবে এক্স্পেরিমেণ্টাল বা ডিমন্স্ট্রেশন স্কুল।

কমিশনের মতে যাঁদের মধ্যে সুদক্ষ শিক্ষক হবার মত যথেষ্ট সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হবে তাঁদেরই ট্রেনিং কলেজে শিক্ষালাভের প্রবেশানুমতি দেওয়া কর্তব্য, সেজন্যে প্রবেশানুমতি দেবার আগে প্রার্থীদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষকতা-পেশায় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, উপরন্তু ছাত্র-শিক্ষকদের সরকারীবৃত্তি দেওয়ার এবং কর্মে নিযুক্ত

শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণকালে পূর্ণ বেতন দেবার ব্যবস্থাও করা দরকার অবশ্য এর বিনিময়ে তাঁরাও পাঁচ বছর শিক্ষকতা করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ থাকবেন। ট্রেনিং কলেজগুলি আবাসী করার জন্যে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সকাল ও সন্ধ্যায় শিক্ষিকাদের শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালীর বিশেষ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পার্টটাইম্ ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন করার সুপারিশও কমিশন করেছেন।

উপসংহারে কমিশন বলেছেন শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ণে শিক্ষণশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই আসলে হবে পথপ্রদর্শক। প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথমে নিজ নিজ ডিমন্স্ট্রেশন বা এক্স্পেরিমেণ্টাল স্কুলে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি সাধনের উপযোগী নতুন নতুন পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বাস্তবে পরিণত করবে তারপর সেই আদর্শে ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষিত করে তাঁদের মাধ্যমে এবং আদর্শে বিদ্যালয়ের সহায়তায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেই অনুপ্রাণিত করবে নতুন ভাবধারায় কাজ করার জন্যে।

পরিশিষ্ট।

নবপরিকল্পিত শিক্ষার প্রসার এবং সুশৃঙ্খল উন্নয়নের জন্যে এর সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থাও সুচিন্তিত হওয়া প্রয়োজন। সকল প্রদেশে একজন মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে রয়েছে শিক্ষাবিভাগ দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারের বিধিব্যবস্থা করার জন্যে। শিক্ষা মন্ত্রীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আছেন শিক্ষাসচিব ও শিক্ষা অধিকর্তা। প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষা অধিকর্তা সরাসরি শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবাদি মন্ত্রীর নিকট পেশ করতে পারেন না, শিক্ষাসচিবের মাধ্যমে তাঁকে সেগুলি মন্ত্রীর নিকট পেশ করতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন মনে করেন মন্ত্রীকে শিক্ষাসংক্রান্ত সকল বিষয়ের পরামর্শদান মুখ্যতঃ শিক্ষা অধিকর্তার কর্তব্য, অতএব যেখানে শিক্ষা অধিকর্তার এবং শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব দু'জন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত সেখানে শিক্ষা অধিকর্তা যাতে সরাসরি মন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাদি করতে পারেন সেজন্যে তাঁকে যুগ্ম সচিবের মর্যাদা দেওয়া কর্তব্য।

প্রত্যেক প্রদেশে এবং কেন্দ্রে সাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞান এবং কৃষি, বাণিজ্য, যানবাহন, শ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান সুসংগত ও পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত করতে হলে শিক্ষাবিষয়ক সকল দপ্তরের মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন, কমিটিতে অর্থমন্ত্রীও থাকবেন। কমিটির সভাপতি এবং সচিবরূপে যথাক্রমে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা অধিকর্তাকে নির্বাচিত করা যেতে পারে। এভাবে সকল দপ্তরের মন্ত্রীরা সম্মিলিত হয়ে স্থির করবেন কি প্রকারে বিভিন্ন দপ্তরের সংগতি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে নিয়োজিত করতে পারলে ভাল হয়।

আবার বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার উন্নতি এবং প্রসারের উপায় সম্মিলিত-ভাবে নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে বিভাগীয় প্রধানদেরও এরূপ একটি সংযোজক কমিটি গঠন করা আবশ্যক।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ্—কমিশনের মতে শিক্ষা অধিকর্তার সভাপতিত্বে পঁচিশ জনের মত সভ্য নিয়ে একটি পর্ষদ্ বা বোর্ড গঠন করে তার ওপর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার ভার অর্পণ করাই ভাল। পঁচিশ জন সভ্য বা সদস্যের মধ্যে দশজনের যন্ত্রশিল্প ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। মাধ্যমিক শিক্ষার বহিঃপরীক্ষাদির পরিচালনা করার জন্যে পাঁচজনের মত সদস্য নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করতে হবে, শিক্ষা অধিকর্তা অথবা পরিচালকমণ্ডলীর কোন প্রবীণ সদস্য এই সাব-কমিটির কন্‌ভেনার বা আহ্বায়ক হবেন।

উপস্নাতক বা আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষাদান ও শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থার পরিচালনা করার জন্যে টিচার্স ট্রেনিং বোর্ড গঠন করার কথাও কমিশন বলেছেন। এই বোর্ডেরও সভাপতি হবেন শিক্ষা অধিকর্তা।

কমিশন মনে করেন শিক্ষাবিভাগকে শিক্ষাদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ের পরামর্শ দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির অনুসরণে সকল প্রদেশে প্রাদেশিক উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে কমিশনের মন্তব্য হল, বিদ্যালয়-পরিদর্শক হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার পর্যালোচনা করে ঐগুলি সমাধানের উপযোগী পরামর্শ দেবেন শিক্ষকমণ্ডলীকে এবং তাঁর সুপারিশ ও পরামর্শমত কাজ করার জন্যে তাঁদের তিনি সহায়তাও করবেন।

শারীরিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চারুশিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিদর্শনের জন্যে ঐ সকল বিশেষ বিষয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বতন্ত্র পরিদর্শক নিয়োগের কথাও কমিশন বলেছেন।

পরিদর্শক উচ্চ শিক্ষিত হবেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার অন্ততঃ দশবছরের অভিজ্ঞতা তাঁর থাকা দরকার কিংবা কোনো উচ্চবিদ্যালয়ে কমপক্ষে তিন বছর প্রধান শিক্ষকের কাজ করা আবশ্যক। তাঁর কর্তব্য দ্বিবিধ, বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার অর্থাৎ বিদ্যালয়ের খাতাপত্র, হিসেব, আফিসের কার্যধারা প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ করা বছরে একবার, আর শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করা। বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণে পরিদর্শককে সহায়তা করার জন্যে যোগ্য সহকারীর প্রয়োজন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান পরিদর্শকের সভাপতিত্বে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ একত্রিত হয়ে করবেন। তাঁরা তিন বছর অন্তর একবার এরূপ অনুসন্ধান করবেন।

বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দান সম্বন্ধে কমিশনের নির্দেশ হল, বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার এবং শিক্ষার উপযুক্ত মান বজায় রাখার উপযোগী নির্দিষ্ট শর্তাবলী পালনে সক্ষম বিদ্যালয়গুলিকেই কেবল অনুমোদন দেওয়া কর্তব্য।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ, গৃহ, সাজসরঞ্জাম, কাজের দিন, ছুটির দিন প্রভৃতি বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশনের অভিমত,—গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে যেখানে পর্যাপ্ত বসতি আছে এবং আশেপাশের গ্রামে যাতায়াতের অসুবিধাও নেই সেরূপ স্থানেই বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার আর শহরে বিদ্যালয়ের জন্যে এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত যেখানে শহরের অতিরিক্ত ভীড়, ব্যস্ততা ও গোলমাল নেই অথচ পরিবহণব্যবস্থার যথেষ্ট সুবিধা আছে। শহরে খেলাধূলোর জন্যে

খোলামেলা স্থান সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয় সেজন্যে সহজপ্রাপ্য উন্মুক্ত স্থানগুলি কয়েকটি বিদ্যালয় একত্রিত হয়ে সংরক্ষণ করবে খেলার মাঠ রূপে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারদের কর্তব্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দ্বারা ঐ সকল স্থান যাতে গৃহ নির্মাণের জন্যে অথবা কোনো শিল্পবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেদখল না হয় তার ব্যবস্থা করা।

বিদ্যালয় ভবনটি যেন প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত হয় এবং শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্যে দশ বর্গফুটের মত জায়গার সংকুলান থাকা আবশ্যক। প্রতি শ্রেণীতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন পর্যন্ত এবং সমগ্র বিদ্যালয়ে পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী থাকাই যথেষ্ট। বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ব্যতীত ছাত্রদের সাধারণ পাঠাগার বা কমনরুম, জলযোগাদির জন্যে নির্দিষ্ট স্থান বা ঘর, পায়খানা প্রস্রাবের জন্যে ছাত্র ও শিক্ষকের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের জন্যেও অনুরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, শিক্ষকদের সাধারণ পাঠাগার, প্রধান শিক্ষকের ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের জন্যে এবং আফিসের জন্যে স্বতন্ত্র এক-একটি ঘর থাকা আবশ্যক। এ ছাড়া, যে সকল বিদ্যালয় নতুন নির্মিত হবে সেগুলিতে বহুমুখী বিদ্যালয়ের সুযোগসুবিধাও থাকা প্রয়োজন। বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপযোগী সাজসরঞ্জাম নির্ধারণের জন্যে বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করাও দরকার। এছাড়া, শহরের এবং গ্রামের বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থাও করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে আসল দামে বই, খাতাপত্র, পেনসিল ইত্যাদি কিনতে পারে সেজন্যে বিদ্যালয়ে সমবায় বিপণি খোলার কথাও কমিশন বলেছেন।

বিদ্যালয়ে কাজের দিন দুশোদিনের কম হওয়া উচিত নয়, সপ্তাহে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের অন্ততঃ পঁয়ত্রিশটি পিরিয়ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিশন বিদ্যালয়ে প্রচলিত অতিরিক্ত ছুটির ব্যবস্থা সমর্থন করেন না, তাঁদের মতে গ্রীষ্মের সময় দু'মাসের এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বছরে দু'বার দশ থেকে পনের দিনের ছুটীর ব্যবস্থা থাকাই শ্রেয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয়ের কাজের সময় নির্দিষ্ট করার স্বাধীনতাও বিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া আবশ্যক।

শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যয়সাপেক্ষ, তাই কমিশন তাঁদের সুপারিশের উপসংহারে এই ব্যয় নির্বাহের জন্যে অতিরিক্ত অর্থ কি ভাবে সংগ্রহ করা যায় সে সম্বন্ধেও কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা। বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে, যেমন, বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনে (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে), ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্যে উন্নত ধরণের পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করায়, শিক্ষকদের শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে, মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যামূলক বিষয়ের অর্থাৎ পাঠক্রম, বৃত্তি নির্বাচনে পথনির্দেশ, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষাদান, পরীক্ষাদির ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে গবেষণার ব্যবস্থা করা ও সেজন্যে গবেষণাগার স্থাপন করায় ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যক্ষ-ভাবে অর্থ সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের বিধিনির্ধারণের জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, খাদ্য, অর্থ ও প্রতিরক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপর্ষদ্ গঠন করা আবশ্যক, পর্ষদের সভাপতি হবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব হবেন এর কর্মসচিব বা সম্পাদক।

তৃতীয়তঃ, মাধ্যমিক স্তরের শিল্পশিক্ষার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইন্ডাসট্রিয়াল এডুকেশন সেস্ নামক উপকর ধার্য করে অর্থ সংগ্রহ

করা প্রয়োজন, সেইসঙ্গে পরিবহণ এবং ডাক ও তার বিভাগের ও রাষ্ট্রীয় করায়ত্ত শিল্পবাণিজ্যের এবং দেবোত্তর ও দাতব্য সম্পত্তির উদ্বৃত্তের কিয়দংশ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যয় করার বিধিসঙ্গত বন্দোবস্ত করাও কর্তব্য।

চতুর্থতঃ, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্যে প্রদত্ত পঁচিশ হাজার ও শিল্পশিক্ষার জন্যে সাহায্যদানের পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষামূলক কাজে ব্যয় করার জন্যে মৃত ব্যক্তির উইল করে দেওয়া সম্পত্তির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কর ধার্য না করে সমুদয় সম্পত্তি যাতে শিক্ষামূলক কাজে ব্যয় করা হয় সেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তৎসংলগ্ন মাঠ প্রভৃতির ওপর সম্পত্তিকর ধার্য করাও উচিত নয় উপরন্তু সম্ভব হলে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারদের কর্তব্য বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতির জন্যে বিনামূল্যে জমি সংগ্রহ করে দেওয়া।

ষষ্ঠতঃ, বিদেশ থেকে আনীত বৈজ্ঞানিক ও কলকারখানার যন্ত্রপাতি এবং পুস্তকাদির জন্যে বহিঃশুল্ক আদায় করা চলবে না।

সমাপ্ত